গীতানুবচন

তৃতীয় খণ্ড

অনির্বাণ

সারস্বত গ্রন্থাবলী সংখ্যা—১৩৯

গীতানুবচন

তৃতীয় খণ্ড

অনির্বাণ

প্রকাশক ঃ
শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী
আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ
পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা
দূরভাষ (০৩৩) ৫৮৫-৮১৬৭/৩১০১

মুদ্রক ঃ
কমলা প্রেস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদলেখক ঃ
শিল্পী শ্রীনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
ভাটপাড়া ঃ উঃ ২৪ পরগণা

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা, ১৩৭৭
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ঝুলনপূর্ণিমা, ১৪০৮

প্রাপ্তিস্থান ঃ
আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ
হালিসহর, উঃ ২৪ পরগণা

মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলেজ স্কোয়ার
কলকাতা-৭০০০৭৩

সর্বোদয় বুক ষ্টল
হাওড়া স্টেশন, হাওড়া

দক্ষিণা ঃ
চল্লিশ টাকা

নিবেদন

শ্রীগুরুভগবানের অসীম কৃপায় গীতানুবচনের তৃতীয় খণ্ডও (তৃতীয় ষট্‌ক) প্রকাশিত হইল। গীতা, উপনিষৎ এবং ব্রহ্মসূত্রকে প্রস্থানত্রয় বলে। এই প্রস্থানত্রয় স্বাধ্যায়-গ্রন্থ। আচার্যমুখে এই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য বা রাহস্যিক অর্থ শ্রবণ করিয়া মনন করিতে হয়। সৌভাগ্যবশত আচার্য শ্রীমৎ অনির্বাণজীর নিকট হইতে প্রশ্নের মাধ্যমে গীতোপনিষদের মর্মব্যাখ্যান অবগত হইয়া ধন্য কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

গীতাকে উপনিষদ্ বলা হয়। বেদেরই অন্ত্যভাগ উপনিষদ্। গীতার বহু পরিভাষারই উৎস বেদ। গীতাব্যাখ্যায় বেদের জ্ঞান অপরিহার্য। বেদজ্ঞানের আলোকে গীতার ব্যাখ্যা কমই দেখিয়াছি। গীতানুবচনের ব্যাখ্যাকে এই দিক দিয়া অভিনবই বলিতে হইবে। ক্রমসোপানন্যায়ে প্রথম ষট্‌ক হইতে দ্বিতীয় ষট্‌ক, দ্বিতীয় ষট্‌ক হইতে তৃতীয় ষট্‌কের আলোচনা গভীর, গভীরতর এবং গভীরতম হইয়াছে। গীতার তত্ত্ববোধার্থ প্রত্যেক স্বাধ্যায়ীরই গীতানুবচন পাঠযোগ্য। উপনিষদের রহস্যব্যাখ্যাও প্রস্তুত হইতেছে। যথাসময়ে তাহার প্রকাশের ইচ্ছাও আছে।

ঋতম্ভরা
৫২, ঠাকুরবাটী ষ্ট্রীট্
শ্রীরামপুর : হুগলী

স্বামী সত্যানন্দ

প্রশ্ন : সত্য

উত্তর : অনির্বাণ

গীতানুবচন

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রশ্ন

'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম' (১৩।২)। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানকেই ভগবান্ প্রকৃত জ্ঞান আখ্যা দিয়াছেন। এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান বলিতে কি বুঝিব? ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানের একটু বিশ্লেষণ করিলে ভাল হয়।

উত্তর

ত্রয়োদশ অধ্যায় হতে গীতার তৃতীয় ষট্‌ক আরম্ভ হল। মানুষের জানবার বিষয় তিনটি—নিজেকে জানা, ঈশ্বরকে জানা এবং পাওয়া, আর সেই আলোকে জগৎকে জানা। প্রথম ষট্‌কে বিবৃত হয়েছিল যোগের দ্বারা আত্মজ্ঞানলাভের উপায়, দ্বিতীয় ষট্‌কে ভক্তির দ্বারা তাঁকে পাওয়ার উপায়। দ্বিতীয় ষট্‌কের মত এই ষট্‌কটিও ভগবান্ শুরু করলেন আপনাথেকে—অর্জুনের কোনও প্রশ্নের অপেক্ষা না রেখে। গীতার প্রাচীনতম ভাষ্য শঙ্করের। তাতে অর্জুনের প্রশ্নের কোনও উল্লেখ নাই। নিজেকে জানলাম, তারপর সেই জ্ঞানকে ভিত্তি করে তাঁকে জানলাম এবং পেলাম। মনে হতে পারে, এইখানেই আমাদের চরম কৃতকৃত্যতা। ভগবান্ বললেন, তা নয়, এরপর ওই জ্ঞান আর বিজ্ঞান আশ্রয় করে জানতে হবে জগৎকে। তবে জানা পূর্ণ হবে। তার জন্যই এই তৃতীয় ষট্‌কের আরম্ভ।

জগৎজ্ঞানের স্বরূপ হল ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান। আর শ্রীকৃষ্ণের মতে এই জ্ঞান তাঁর অনুমোদিত অতএব পরম জ্ঞান (১৩।২)।

বিশ্বজগৎ সম্পর্কে ক্ষেত্রের উপমাটি বেদে আছে। ক্ষেত্রজ্ঞের জায়গায় সেখানে দুটি সংজ্ঞা আছে—ক্ষেত্রপতি আর ক্ষেত্রবিৎ। পরমপুরুষ ক্ষেত্রপতি, আর আত্মবিৎ এবং ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ক্ষেত্রবিৎ। গীতার সংজ্ঞাটিতে বেদোক্ত দুটি ভাবনারই সমাহার ঘটেছে।

সাংখ্যদৃষ্টিকে অনুসরণ করে গীতায় প্রকৃতিকে বলা হয়েছে ক্ষেত্র আর পুরুষকে ক্ষেত্রজ্ঞ (১৩।১৯)। কিন্তু গীতায় প্রকৃতি ভগবানের আত্মপ্রকৃতি (৪।৬, ৭।৪-৫), অতএব স্বরূপত চিন্ময়ী। অন্যত্র ভগবান্ এই ক্ষেত্র বা প্রকৃতিকে বলেছেন, 'মহদ্‌ব্রহ্ম'রূপ তাঁর যোনি, যাতে তিনি পিতারূপে বীজাধান করেন (১৪।৩-৪)। আবার পুরুষ যেমন দ্রষ্টা, তেমনি ভোক্তা এবং মহেশ্বরও অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্ব ভোক্তৃত্ব এবং কর্তৃত্ব এই তিনেরই অবাধ সমাবেশ হয়েছে তাঁর মধ্যে (১৩।২২)।

এই প্রকৃতি-পুরুষ বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হতে স্থাবরজঙ্গম সমস্ত সত্ত্বের সঞ্জনন হয়েছে (১৩।২৬)। বিশ্বলীলায় প্রকৃতি কর্তৃত্বের হেতু, আর পুরুষ ভোক্তৃত্বের হেতু (১৩।২০)। হেতু হল প্রয়োজক অর্থাৎ যে কোনও একটা-কিছু ঘটিয়ে তোলে স্বতন্ত্র থেকে।

বিশ্বলীলা ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের লীলা। এই লীলাকে আমরা সবচাইতে নিকটে থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারি আমাদের নিজেদের মধ্যে। বেদে একে বলা হয়েছে অধ্যাত্মদৃষ্টি, যার মূলে আছে অধিদৈবতদৃষ্টি অর্থাৎ বিশ্বে দেবলীলার প্রত্যক্ষ।

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমাদের শরীর হল ক্ষেত্র, আর শরীরকে যিনি জানছেন, তিনি হলেন ক্ষেত্রজ্ঞ (১৩।১)। তাইতে জীবমাত্রেই ক্ষেত্রজ্ঞ, কেননা শরীরের মধ্যে যা ঘটছে না-ঘটছে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান তার আছে। কিন্তু এ-জ্ঞান সবসময় সম্পূর্ণ জ্ঞান নয়—এ যেন সূর্যের কাছ

থেকে ধার করা চাঁদের আলোর মত। তাই যিনি সমস্ত তমিস্রার পারে জ্যোতির জ্যোতীরূপে সবার হৃদয়ে অবস্থিত (১৩।১৭), সেই পরমপুরুষই যথার্থ ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ (১৩।২), সবার হৃদয়ে থেকে সবাইকে যন্ত্রারূঢ়ের মত ভ্রামিত করছেন (১৮।৬১)। তাই তিনি ক্ষেত্রপতিও। তাঁকে জানলেই তবে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান পূর্ণ হয় (তু. ১৩।১২)।

আবার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ক্ষেত্র বলতে শুধু স্থূল শরীরটিকে বুঝলেই চলবে না। বুঝতে হবে পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়দশক, ইচ্ছা-দ্বেষ এবং সুখ-দুঃখরূপ মনোবৃত্তি, অহঙ্কার, বুদ্ধি, এদের 'সংঘাত' কি-না বিশেষ কোনও লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য জমাট বাঁধা (organisation) এবং 'ধৃতি' কি-না এদের ক্রিয়াকে ওই লক্ষ্যের দিকে চালিয়ে নেওয়া ওদের রাস টেনে রেখে (তু. ১৮।৩৩), আর এ সব-কিছুর মধ্যে হেতুরূপে পরিব্যাপ্ত এক 'চেতনা' আর সেই চেতনার পঞ্চেন্দ্রিয়গোচর বিষয়—এইসব নিয়ে তবে 'ক্ষেত্রের' মোটামুটি পরিচয় (১৩।৫-৬)। এক-কথায় ক্ষেত্র এখানে ব্যষ্টি জীবের সমগ্র জগৎ—তার আত্মচৈতন্যের শ্রীক্ষেত্র, যার অধিষ্ঠাতা অন্তর্যামী জগন্নাথ। বস্তুত এই ক্ষেত্র তাঁরই, তাই তাঁর আরেক সংজ্ঞা 'ক্ষেত্রী'—যার মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং ক্ষেত্রপতি এই দুটি ভাবনার সমাহার ঘটেছে। এক সূর্য যেমন সমস্ত লোককে প্রকাশিত করে, তেমনি এই ক্ষেত্রী সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করছেন একাধারে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং ক্ষেত্রপতি হয়ে (১৩।৩৩)।

ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ওই ক্ষেত্রপতিরই আত্ম-বিভূতি। চিদ্‌বীজরূপে তিনিই সব ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হচ্ছেন। অঙ্কুর একদিন বনস্পতি হবে, জীব একদিন ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রপতিকে জেনে তাঁরই মত ক্ষেত্র-পতি হয়ে তাঁর ভাব লাভ করবে—এই তার দিব্য নিয়তি (১৩।১৮)। এই নিয়তিকে সার্থক করবার জন্যই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিজ্ঞান আমাদের অপেক্ষিত।

গোড়ায় এই জ্ঞান পেতে হবে বিবেকের দ্বারা। সামান্যত ক্ষেত্রজ্ঞ হলেও ক্ষেত্রের সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি, তাই আমরা সত্যকার ক্ষেত্রজ্ঞ বা ক্ষেত্রপতি নই। ক্ষেত্র হতে ক্ষেত্রজ্ঞকে—অথবা সাংখ্যরীতিতে অপরা প্রকৃতি হতে পুরুষকে—আলাদা করে জেনে প্রকৃতির বন্ধন হতে আমাদের মুক্ত হতে হবে (১৩।৩৪)। তবে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিজ্ঞান আমাদের অধিগত হবে।

প্রশ্ন

'এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা' (১৩।১২)। আত্মজ্ঞানের সাধন-তালিকার তাৎপর্য কি? এখানে তো জ্ঞান জন্য অর্থাৎ করণ-সাপেক্ষ বা সাধন-সাপেক্ষ হইয়া গেল। জ্ঞান জন্যপদার্থ নহে, শাস্ত্রে ত এইরূপ কথাও আছে—'সংবিদেষা স্বয়ংপ্রভা'।

উত্তর

'জ্ঞান' বলতে এখানে বুঝতে হবে জ্ঞানের সাধন। অবশ্য তার ফলে যে-উপলব্ধি, তা-ও জ্ঞান। তার কথা পরে আছে (১৩।১৭)।

এই সাধনগুলির মধ্যে একটা ক্রম আছে—যদিও অক্রমে সাধনাও বিরল নয়। ক্রমটি এই :

প্রাণের প্রবেগে ঝোঁকের মাথায় সংসার করি—প্রথমটায় তার মধ্যে দোষের কিছুই দেখতে পাই না। কিন্তু একদিন প্রবেগ মন্দীভূত হয়, জরা আর ব্যাধি এসে দেহকে আক্রমণ করে। সামনে মৃত্যুর বিভীষিকা। পিছনপানে তাকিয়ে দেখি, দেহের বৈকল্য ছাড়া মনের দুঃখেও কিছু কম নাজেহাল হইনি। মৃত্যুতে সব দুঃখের শান্তি। কিন্তু মৃত্যুর পর আবার জন্ম আছে। আর জন্মালেই দুঃখও আছে। জন্মজন্মান্তর ধরে একটা দুঃখের চাকা এমনি করে ঘুরছেই।

সময় থাকতে সবার এটা খেয়ালে আসে না। যার আসে, সংসার-সম্পর্কে তার আর মোহ থাকে না, সংসারের দোষগুলি সে

স্পষ্ট দেখতে পায় (১৩।৮)। দোষানুদর্শনের ফলে আসক্তি শিথিল হয়ে যায়, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে আর তেমন করে আঁকড়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছা করে না (১৩।৯)। মনের বৈরাগ্য ইন্দ্রিয়েও সংক্রামিত হয়—বিষয়ভোগ যেন আলুনি লাগে (১৩।৮)। যে-অহঙ্কারের বশে এতদিন সে আত্মাভিমান আর দম্ভ নিয়ে মাথা উঁচিয়ে চলত সবার মধ্যে, সে-মাথা যেন কোথাও লুটিয়ে পড়তে চায় (১৩।৮)। এবার প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন আর সেবার আকূতি নিয়ে (তু. ৪।৩৪) কোনও দিশারীর পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে।

আচার্যোপাসনা হতেই শুরু হল নতুন জন্ম, অভ্যস্ত প্রাকৃত জীবন পিছনে পড়ে রইল। সংসার যেমন ছিল তেমনি আছে, কিন্তু উপাসকের ভিতরটা একেবারে বদলে গেছে। শুচি ও শ্রীমান্ আচার্যের সংস্পর্শে নিজের অন্তরও তার শুচি হয়েছে, আর তাইতে তা স্থিরও হয়েছে। আত্মানুসন্ধিৎসার ফলে ইন্দ্রিয়সংযমও সহজ হয়েছে (১৩।৭)। কারও প্রতি আর বৈরভাব নাই, মানুষের গুরুতর অপরাধও যেন অনায়াসে ক্ষমা করা যায়। ইষ্টানিষ্ট যা-ই আসুক না কেন, চিত্তের সমতা আর তাতে নষ্ট হয় না (১৩।৯)। কি করে জীবন যেন ঋজু আর সহজ হয়ে গেছে। বাইরের জগৎটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বার ভাবটা আর নাই, এখন আপন মনে একলা কোথাও থাকতেই ভাল লাগে, জনসঙ্গেও আর তেমন রুচি নাই (১৩।১০)। এখন দিনে-দিনে নিজের স্বরূপ নিজের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, সব-কিছুর আসল তত্ত্বটা যে কি তা জানতে আর বুঝতে এখন বাকী নাই। তাইতে চিত্ত এখন প্রসন্ন এবং বুদ্ধিও স্থির (তু. ২।৬৫)। আর স্থির বুদ্ধির সেই প্রসাদের পরিপাকে ধীরে-ধীরে বিকশিত হয়েছে ভগবানে অব্যভিচারিণী অনন্যা ভক্তি, যা জীবের পরম পুরুষার্থ (১৩।১০)।

বিষয়াসক্তি হতে ভগবদ্‌ভক্তিতে উত্তরণের এই ছক। এই সাধনাকে বলা হয়েছে জ্ঞান। জ্ঞান—সাধন সাধ্য এবং সিদ্ধি তিনই

হতে পারে। জ্ঞানস্বরূপে পরমপুরুষ আমাদের সাধ্য বা জ্ঞেয়। তাঁকে পাওয়ার যে-সাধনা, তা-ও জ্ঞান। আবার প্রাপ্তিও জ্ঞান। প্রাপ্তির গোড়াতে আয়াস থাকে। তখন জ্ঞান জন্য। সেটা তো দোষের নয়। প্রাপ্তি যখন অনায়াস হয়, তাঁতে নিত্যস্থিতি হয়, তখনই জ্ঞান 'সহজ'। তখন বোধ হয়, এ-জ্ঞান আমার স্বরূপ বা স্বভাব। স্বরূপ কখনও 'জন্য' হতে পারে না। এই অজন্য অতএব সহজ স্বরূপ-জ্ঞানকে বলা হয় সম্বোধি—রামকৃষ্ণদেব যাকে বলতেন 'বোধে বোধ হওয়া', ওই সহজে পৌঁছবার জন্যই অতখানি কসরত করতে হয়। তাও জ্ঞান, এবং তা সাধনা বলে জন্য। উপনিষদে প্রজ্ঞান একাধারে প্রমাণ প্রমেয় এবং প্রমা। (তু. 'প্রজ্ঞানেনৈনম্ আপ্নুয়াৎ': আবার 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'।) একেবারে সোজাসুজি প্রজ্ঞান দিয়েই প্রজ্ঞানকে পাওয়ার পথও আছে—যেমন শুকদেব পেয়েছিলেন। কিন্তু তার অধিকারী অতি বিরল। ব্যাপারটা সূর্যের আলোয় ফুল ফোটার মত। ক্ষণেকের জন্য এমন-একটা অবস্থা সবারই আসতে পারে, কিন্তু তা থাকে না। উপনিষদ উপমা দিয়েছেন বিদ্যুতের উন্মেষ আর নিমেষের। জন্য জ্ঞানকে পতঞ্জলি বলেছেন 'শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞ'। কিন্তু উপর দিক থেকে দেখতে গেলে দুইই প্রজ্ঞা।

প্রশ্ন

পরব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন—তবে কি? বেদে উপনিষদে তো ব্রহ্মকে কোন জায়গায় সৎও বলা হইয়াছে, আবার অসৎও বলা হইয়াছে।

উত্তর

জ্ঞানের সাধনায় যিনি জ্ঞেয়, তিনি ব্রহ্ম। আবার তিনি জ্ঞানও। তাহলে আমার জ্ঞান দিয়েই আমি তাঁকে পাই জ্ঞানরূপে। তখন তাঁর জ্ঞানে আমার জ্ঞান মিলিয়ে যায়। যেমন সূর্যোদয়ের আগে শুকতারা দেখে মনে হয়, এবার সূর্য উঠবে। 'শুকতারাই

যেন বলছে, 'আ জ্যোতিরেতি'—ওই যে আলো আসছে। কিন্তু শুকতারার আলো সূর্যেরই আলো। সূর্য উঠলে পর শুকতারা তাঁর আলোতে মিলিয়ে যায়। যতক্ষণ সে বলতে পারছিল, 'ওই যে আলো আসছে', ততক্ষণ তার কাছে আলো 'সৎ' কিনা আছে। যখন ওই আলোতে সে মিশে গেল, তখন সেও নাই, কাজেই তার দেখা আলোও নাই। তার দিক থেকে আলো 'অসৎ' কিনা নাই। কিন্তু আসলে আলো নিত্য-সৎ—শুকতারার আলো দিয়ে তার স্বরূপের বিচার চলে না। তাই সে 'সৎ'ও নয়, 'অসৎ'ও নয়। অর্থাৎ সে যে কি তা বলা যায় না, সে অনির্বচনীয়। তেমনি আমাদের জ্ঞানের দিক থেকে ব্রহ্ম অনির্বচনীয়। আমাদের জ্ঞান দিয়ে তাঁকে মাপা যায় না ; কিন্তু তবুও বোধে তাঁর বোধ হয়।

সৎ আর অসৎ একটা বিকল্প। তার চারটি কোটি সম্ভব। যেমন (১) 'সৎ', (২) 'অসৎ' ; আবার (৩) 'সৎ ও অসৎ' একসঙ্গে ; আবার (৪) 'সৎও নয়, অসৎও নয়'। এই চারটি কোটির প্রত্যেকটি ব্রহ্ম সম্বন্ধে খাটে। তবুও তাঁর পার পাওরা যায় না। তাই বলা হয়, তিনি 'সৎ'ও নন, 'অসৎ'ও নন ; আবার 'সদসৎ'ও নন, 'ন সৎ নাসৎ'ও নন। অর্থাৎ তিনি যে কি তা বলা তো যায়ই না, বোধেও তাঁর কূল মেলে না।

কেউ বললেন, ব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ—যেন সূর্য। তাঁর কাছে ব্রহ্ম 'সৎ'। কেউ বললেন, সূর্যও ডুবে যায়, থাকে আকাশ ; ওই আকাশই ব্রহ্ম। তাঁর কাছে ব্রহ্ম 'অসৎ'। কেউ আকাশ আর সূর্যকে একসঙ্গে ধারণা করে বললেন, ব্রহ্ম সূর্যও আকাশও। তাঁর কাছে ব্রহ্ম 'সদসৎ'। সৎ আর অসৎ-এর দ্বৈত পার হয়ে কেউ বললেন, তিনি সৎও নন অসৎও নন—তিনি এমন একটা-কিছু যা থেকে ওই সৎ আর অসৎ দুইই বেরিয়ে এসেছে।

চারটি অনুভবই সত্য, বেদে-উপনিষদে চারটিরই বিবৃতি আছে (দ্র. 'সৎ' ঋ. ১।১৬৪।৪৬ ; 'অসৎ' ১০।৭২।২-৩ ; 'সৎ ও অসৎ'

১০।৫।৭ ; 'সৎও নয়, অসৎও নয়' ১০।১২৯।১ ইত্যাদি ; আরও দ্র. তৈউ., ছা., শ্বে…)। অনুভবগুলি যেমন পৃথক্-পৃথক্ দৃষ্টিতে সত্য, তেমনি আবার একযোগেও সত্য। তবুও তাঁর কূল পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন

'সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্' (১৩।১৪)—এই শ্লোকটির রহস্যার্থ কি ? 'নির্গুণং' অথচ 'গুণভোক্তৃ চ'—ইহা সম্ভব হয় কেমন করিয়া ?

উত্তর

ব্রহ্ম সৎও নন, অসৎও নন। আবার তিনি সৎ এবং অসৎ দুইই। যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর, তা সৎ। যা ইন্দ্রিয়ের অতীত, তা অসৎ। বেদ যখন বলেন, 'পুরুষ সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ এবং সহস্রপাৎ'—সবদিক থেকে এই ভূমিকে তিনি আবৃত করে আছেন, তখন বেদ 'সদ্ব্রহ্মের' কথা বলেন। তখন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই যা-কিছু সবই ব্রহ্ম। এই যা-কিছু, তা আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের বিষয়। তা ব্রহ্মই। কিন্তু আবার তিনি 'অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্'—একে দশ আঙুল ছাপিয়ে আছেন। সেটি আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের অতীত। তাই ব্রহ্ম তখন অসৎ-কল্প।

আবার ওই অসৎ থেকেই সৎরূপে তিনি আবির্ভূত হচ্ছেন। সৎরূপে যেন তাঁর সীমা আছে—আমাদের ইন্দ্রিয়গোচরতার সীমা। কিন্তু অসৎরূপে তিনি অসীম—সেখানে চোখ যায় না, বাক্ যায় না, মনও যায় না। অথচ তখনও ব্রহ্মের বোধ হয়। এই বোধ ইন্দ্রিয়বিবর্জিত বোধ। অথচ ওই অতীন্দ্রিয় হতেই ইন্দ্রিয়গুণ বেরিয়ে আসছে জাগ্রতে। তাহলে অবস্থাটিকে বলা যেতে পারে ইন্দ্রিয়বিবর্জিত হলেও ইন্দ্রিয়গুণের আভাসযুক্ত।

এই আভাসটি ইন্দ্রিয়ের শক্তিরূপ। শক্তির উন্মেষে সৃষ্টি, ব্রহ্ম তখন সদ্‌রূপ। শক্তির নিমেষে প্রলয়, ব্রহ্ম তখন অসদ্‌রূপ। কিন্তু শক্তির নিমেষেও তিনি শক্তিহীন নন। উন্মেষের উন্মুখীনতা তখনও আছে। তাকেই বলা হচ্ছে ইন্দ্রিয়বিবর্জিত ইন্দ্রিয়গুণাভাস। যেমন দেখি ভ্রূণে বা বীজে। নীলাচলের জগন্নাথবিগ্রহে দেখি এই ভাবনার শিল্পরূপ।

ব্রহ্ম যুগপৎ সৎ এবং অসৎ। ছুটি শ্লোকে তারই বিবৃতি। যেমন তিনি বিশ্বরূপ, তেমনি তিনি অরূপ। বিশ্বরূপে চলছে তিন গুণের লীলা। এই লীলারস তিনি আস্বাদন করছেন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থেকে। তাই তিনি গুণভোক্তা। কিন্তু সেইসঙ্গেই তিনি বিশ্বাতীত অরূপ। বিশ্বের অতীতে গুণলীলা নাই। তাই তিনি নির্গুণ। তিনি যেমন নির্গুণ, তেমনি গুণভোক্তাও। পর্যায়ক্রমে নয় —যুগপৎ। নির্গুণে-সগুণে বিবাদ বাধায় প্রাকৃত মন-বুদ্ধি। উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে পাপবিদ্ধ, অতএব দ্বৈতদর্শী। শুদ্ধ বুদ্ধি অদ্বৈতদর্শী। দ্বৈতকে কুক্ষিগত করেই সে অদ্বৈতকে দেখে। অদ্বৈত একদিকে যেমন দ্বৈতকে ছাপিয়ে আছে, আরেকদিকে তেমনি তাকে ধরেও আছে। তাইতে বলা হচ্ছে, ব্রহ্ম 'অসক্ত' অথচ 'সর্বভৃৎ'—সবাইকে তিনি ধরে আছেন, অথচ কোথাও জড়িয়ে যাচ্ছেন না। নির্গুণ বলেই জড়িয়ে যাচ্ছেন না, আবার গুণভোক্তা বল্লেই সর্বভৃৎ।

এই দৃষ্টিই অখণ্ড ব্রহ্মদৃষ্টি—নির্গুণে-সগুণে ভাগাভাগি করে পর্যায়ক্রমে খণ্ডের দর্শন নয়। প্রথমে নির্গুণে যাবার সময় সগুণকে 'নেতি নেতি' বলে প্রত্যাখ্যান করতে হয়। কিন্তু নির্গুণে স্থিতি হলে দেখি, ওথেকেই সগুণ বেরিয়ে আসছে। নির্গুণ তখন সগুণের সাধক—বাধক নয়।

এই অখণ্ড বোধটিই পরবর্তী শ্লোককয়টিতে প্রপঞ্চিত হয়েছে।

প্রশ্ন

'জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্' (১৩৷১৭)—গীতার এই শ্লোকটির তাৎপর্য কি? জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানগম্যরূপে সকলের হৃদয়ে তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। প্রত্যেকটি শব্দের বিশ্লেষণ করিবেন কি?

উত্তর

এই শ্লোকটির তাৎপর্য মোটামুটি আগেই বলা হয়েছে। ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ হল, তিনি 'জ্ঞান' কিনা অখণ্ডচৈতন্যস্বরূপ। 'জ্ঞানগম্য' শব্দের জ্ঞান বোঝাচ্ছে জ্ঞানের সাধনাকে, সে-সাধনা করবে জীব। এই জ্ঞান বা জ্ঞানের সাধন কি, তা সবিস্তারে আগেই বলা হয়েছে (১৩৷৭-১১)। এই জ্ঞান দ্বারা তিনি 'জ্ঞেয়' অর্থাৎ জ্ঞানরূপে সর্বজীবের পরম পুরুষার্থ। তাঁকে জানতে হবে বাইরে নয়, অন্তরে—কেননা আমার যে-জ্ঞান, তা তাঁরই জ্ঞানের বিভাব। আমার জ্ঞান জ্যোতি, তিনি সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ (১৩৷১৭)। তাইতে তিনি আমাদের সবার হৃদয়ে 'বিষ্ঠিত' কিনা বিচিত্ররূপে অবস্থিত। তাঁরই জ্ঞানের আলো সবার মধ্যে—রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় 'কোথাও একটা বাতি, কোথাও বা আঠারটা বাতি'। আমার যে-আত্মজ্ঞান, তা সাধনায় রূপান্তরিত হবে তাঁর তত্ত্বজ্ঞানে (১৩৷১১)। আর এই আত্মজ্ঞানসহচরিত ব্রহ্মজ্ঞানে জগতেরও তত্ত্বজ্ঞান হবে—যা গীতার তৃতীয় ষট্‌কের প্রতিপাদ্য।

জ্ঞেয়রূপে তিনি সাধ্য, আর জ্ঞানরূপে তিনি সাধন ও সিদ্ধি দুইই—একথা আগেই বলেছি।

প্রশ্ন

উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মা কি এক? এই দেহের মধ্যে তাঁহাদের প্রত্যেকের কার্য কি?

উত্তর

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানকে সাংখ্যের দিক থেকে প্রকৃতি-পুরুষের জ্ঞানও বলা যেতে পারে (১৩।১৯-২৩)। তবে গীতোক্ত সাংখ্য-দর্শনে অপরা প্রকৃতি স্বরূপত পরমপুরুষেরই প্রকৃতি অতএব চিন্ময়ী, জড়ের ক্রিয়া হয় চেতনারই ঈক্ষায় এবং প্রেষণায়—এই কথাগুলি মনে রাখতে হবে।

এখানে ক্ষেত্রজ্ঞের আমরা তিনটি পরিচয় পাচ্ছি। প্রথমত, শরীর ক্ষেত্র এবং তাকে যিনি জানেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ (১৩।১)। এই ক্ষেত্রজ্ঞ প্রাকৃত জীব এবং আত্মবিৎ পুরুষ দুইই হতে পারেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রজ্ঞকে ঋক্‌সংহিতায় ক্ষেত্রবিৎ বলা হয়েছে—এও বলেছি।

কিন্তু আসল ক্ষেত্রজ্ঞ—এমন-কি প্রাকৃত জীবের মধ্যেও সত্যকার ক্ষেত্রজ্ঞ হলেন ঈশ্বর, যিনি সর্বভূতের হৃদ্‌দেশে যন্ত্রিরূপে অধিষ্ঠিত (১৮।৬১)। তাঁকে আবার দুদিক থেকে দেখা যেতে পারে—ব্রহ্মরূপে এবং পরমাত্মরূপে। ব্রহ্মরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আমাদের জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য এবং চরমে জ্ঞানস্বরূপ (১৩।১৭)। তিনিও সবার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, তা না হলে তিনি জ্ঞানগম্য হতেন না, তাঁর অপরোক্ষ জ্ঞানও সম্ভব হত না। তিনি সর্বভূতের বাইরে-ভিতরে, সবার মধ্যে অবিভক্ত থেকেও যেন বিভক্তবৎ, তিনি অচর আবার চরিষ্ণু, সব-কিছুর উদয় এবং বিলয় তাঁতেই, তিনি একাধারে বিশ্বরূপ এবং বিশ্বাতীত ইত্যাদি (১৩।১২-১৭)। তাঁর একটি বিশিষ্ট পরিচয় হল, তিনি সর্বাধার। যেমন একই সমুদ্র থেকে তরঙ্গ ফেনা বুদ্‌বুদ্‌রূপে অগণিত বৈচিত্র্যের বিস্তার, তেমনি তাঁহতে ভূত-গ্রামের বিস্তার (১৩।৩০)। সমস্ত বৈশিষ্ট্যের আধাররূপে এক নির্বিশেষ ব্যাপ্তিচৈতন্য—যেন আকাশের মত, এই তাঁর অনুভব। ক্ষেত্রজ্ঞের এই দ্বিতীয় পরিচয়।

এই 'অব্যয়' অর্থাৎ অক্ষর ব্রহ্মই পরমাত্মরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ—ক্ষেত্রজ্ঞের এই তৃতীয় পরিচয় (১৩৷৩১)। প্রকৃতি-পুরুষের ভাবনা থেকেই পরমাত্মার ভাবনা এসেছে। পুরুষ চৈতন্য, আর প্রকৃতি শক্তি। দুটিতে একটি অনাদি মিথুন। পুরুষের অধ্যক্ষতায় গুণক্ষোভের মাধ্যমে প্রকৃতি জগৎজোড়া বিকৃতি সৃষ্টি করে চলেছেন (১৩৷১৯ ; দ্র. ৯৷১০)। এই পুরুষ পরমপুরুষ, আর প্রকৃতি তাঁর 'স্বীয়া মামিকা' প্রকৃতি (৯৷৭-৮) অথবা পরমা প্রকৃতি। আবার পরমপুরুষই বহুধা প্রজাত হয়ে জীব হয়েছেন। পুরুষ যখন জীব, তখন তাঁর মধ্যে প্রকৃতির অপরা এবং পরা—এই দুটি বিভাব। অপরা প্রকৃতিতে চলছে জীবের যন্ত্রলীলা, কিন্তু তা বিধৃত রয়েছে পরা প্রকৃতিতে (৭৷৪-৫)—যা জীবচেতনার উৎক্রান্তির হেতু। বেদে তাকে বলা হয়েছে প্রজ্ঞানের 'আবিস্তরতা' অর্থাৎ ক্রমিক উন্মেষ (ঐতরেয়ারণ্যক ২৷৩৷২)। চরম প্রজ্ঞান জীবের আত্মানুভবে—যা সিদ্ধ হয় অপরা প্রকৃতি হতে আত্মচৈতন্যকে বিবিক্ত করে। ব্যষ্টি-জীবের এই অনুভব। আর বদ্ধ-মুক্তনির্বিশেষে সমষ্টি জীবাত্মার যে-অনুভব, তা-ই হল পরমাত্মার অনুভব।

একই পরমপুরুষের দুটি বিভাব—ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা। স্বরূপত ব্রহ্ম অক্ষর পুরুষ (দ্র. ৮৷৩,১৫৷১৬)। কিন্তু বেদ বলছেন, এই অক্ষরেরও ক্ষরণ আছে—'ক্ষরত্যক্ষরম্' (ঋ. ১৷১৬৪৷৪২)। ক্ষরণ হল তাঁর অটল থেকেই ছলকে পড়া—'শতধারম্ উৎসম্ অক্ষীয়মাণম্' হয়ে (ঋ. ৩৷২৬৷৯)। এই ক্ষরণকে অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে গর্ভাধান বা বীজপ্রদান বলে (১৪৷৩,৪)। বৈদিক বৃষভ-ধেনুর মত ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মশক্তি তখন একটি মিথুন—তিনিই তাঁর যোনি, যার অপর সংজ্ঞা মহদ্‌ব্রহ্ম (ঐ ; তু. ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ৩৷১৫)। এখানে মহদ্‌ব্রহ্ম ক্ষেত্র, আর ব্রহ্ম ক্ষেত্রজ্ঞ।

অনুরূপ ভাবনা পরমাত্মা বা 'পুরুষঃ পরঃ' (১৩৷২২) এবং তাঁর স্বীয়া প্রকৃতি, যা তাঁর বিসৃষ্টির আধার (৭৷৪-৬)। সেখানে

'স্বীয়া প্রকৃতি' ক্ষেত্র এবং পরমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের এই তৃতীয় পরিচয়।

এই পরিচয়টিই ঘনিষ্ঠ, কেননা এটি অনুভূত 'দেহেঽস্মিন্' —এই দেহেই (১৩।২২)। দেহে শুধু আত্মারূপে নিজেকে অনুভব করা নয়, আরও গভীরভাবে পরমপুরুষকে অনুভব করা— এইখানে এই অনুভবের উৎকর্ষ। এই অনুভবই নিজের মধ্যে পুরুষোত্তমের অনুভব, কেননা পরমাত্মা আর পুরুষোত্তম এক কথা (১৫।১৭…)। এই পরমাত্মাকে অন্যত্র অধিযজ্ঞ পুরুষও বলা হয়েছে (৮।৪)—কেননা 'সর্বলোকমহেশ্বর' হয়েও, এই দেহে থেকেই তিনি আমাদের যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা এবং সুহৃদ্ (৫।২৯)।

আবার পরমাত্মার অনুভবটি অক্ষর-ব্রহ্মের অনুভব হতেও উত্তম (১৫।১৮)—কেননা এই অনুভবটি যেমন যুগপৎ বিশ্বোত্তীর্ণ এবং বিশ্বাত্মক, তেমনি দেহগত অনুভব হওরায় পরমপুরুষের বিগ্রহবত্তারও অনুভব। এটিকেই ইতিপূর্বে 'রাজ্যবিদ্যা রাজগুহ্য' বলে বর্ণনা করা হয়েছে (৯।২)। এ হল তাঁকে একই সময়ে পরাৎপর, ভূত-মহেশ্বর এবং মানুষী-তনু-আশ্রিতরূপে অনুভব করা।

অনুভবটি হয় এই দেহেই। মরমীয়ার ভাষায় তখন, 'এ-দেহে ও-দেহে একহি রূপ, তবে তো জানিবে রসের কূপ'। তাইতে এটি একাধারে আত্মা এবং পরমাত্মার অনুভব। আত্মানুভবই ক্রমিক উৎকর্ষের ফলে পর্যবসিত হচ্ছে পরমাত্মার অনুভবে— শ্লোকটিতে এমনিতর একটি নিগূঢ় ব্যঞ্জনা আছে। সাধক এবং সিদ্ধের অনুভব এখানে ওতপ্রোত।

অনুভবের ক্রমটি এই। প্রথম অনুভব 'উপদ্রষ্টা'র। উপদ্রষ্টা পুরুষ প্রকৃতির কাছে দাঁড়িয়ে তার কাজ দেখে যাচ্ছেন। কাজ করছে প্রকৃতি, কার্য-কারণ-কর্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ তার অকর্তা দ্রষ্টামাত্র (১৩।২০, ২২)। সমষ্টি দৃষ্টিতে এটি হল

ব্রহ্মের 'নির্গুণ ভাব' (১৩।১৪)—উপনিষদের ভাষায় তিনি 'সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ' (শ্বে. ৬।১১)।

এখানে একটা কথা আছে। পুরুষের তিনটি বিভাব—তিনি দ্রষ্টা, ভোক্তা এবং কর্তা। সাংখ্যবাদীরা বলেন, এর মধ্যে দ্রষ্টৃত্বই পুরুষের স্বরূপ। দ্রষ্টা পুরুষ প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত বা আলাদা—প্রকৃতির সঙ্গে তিনি জড়িয়ে যান না, কাজেই তার দেওয়া সুখ-দুঃখ তিনি ভোগ করেন না, তার কাজে যোগ দেওয়ারও কোনও আগ্রহ তাঁর নাই। তিনি ভোক্তা নন, কর্তা নন—শুধু দ্রষ্টা।

সাংখ্যের ভাষায় একে বলা হয় দ্রষ্টার স্বরূপাবস্থান। খুব উঁচু অবস্থা, প্রকৃতির গুণলীলার বাইরের অবস্থা। বিশ্বের মূলেও এমনিতর একটি ভূমি আছে, বেদে যাকে বলা হয়েছে অসৎ বিনশন অসম্ভূতি ইত্যাদি। বলা হয়েছে, পুরুষের একপাদ এই বিশ্বভূত, আর তাঁর ত্রিপাদ দ্যুলোকে অমৃত হয়ে আছে (ঋ. ১০।৯০।৩)। বিসৃষ্টি নাই, কাজেই প্রকৃতির খেলা নাই—পুরুষ সেখানে নিষ্ক্রিয়।

কিন্তু তাবলে তিনি নিঃশক্তিক নন। ওই অতিস্থিতির ভূমিতেও তাঁর শক্তি আছে—বেদে তাকে বলা হয়েছে 'মায়া'। গীতায় বলা হচ্ছে পুরুষের 'আত্মমায়া' (৪।৬) বা 'যোগমায়া' (৭।২৫)। এ-মায়া কিন্তু অবিদ্যা নয়, উপনিষদের ভাষায় পুরুষের 'প্রজ্ঞা পুরাণী' (শ্বে. ৪।১৮)। প্রজ্ঞা অর্থে মায়া সংজ্ঞার প্রচুর ব্যবহার বেদে আছে।

সৃষ্টির পূর্বে পুরুষ যখন নিজের মধ্যে নিজে গুটিয়ে আছেন, তখন এই মায়া তাঁর 'স্বধা' বা 'শ্রী' কিনা তাঁর আপনাতে আপনি থাকা, এ তাঁর 'রমা' কিনা আত্মারামতা। এইখানে তাঁর খুঁটি। এইখান থেকেই তিনি অক্ষর থেকেও ক্ষরিত হচ্ছেন, অটল থেকেও টলছেন।

তাঁর টলুনিতে জগৎ। তার মধ্যে আমরা। আমরাও টলছি। টলুনিটা প্রকৃতির গুণলীলা, সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের দোলা। অনেকসময়ই তা ভাল লাগে, কিন্তু সবসময় লাগে না। তখন একটা অটল স্থিতি খুঁজি—কিন্তু পাই না। পেলেও তাকে বজায় রাখতে পারি না।

তখন আমাদের পুরুষার্থ হয় কোনরকমে ওই অক্ষরস্থিতিতে পৌঁছে যাওয়া, আর ঝাঁকুনি খেতে এখানে না আসা।

তার পথ বাতলে দিলেন সাংখ্যকার। অপরা প্রকৃতি থেকে তফাত হয়ে যাও। তার (ভোগ আর ঐশ্বর্য কিনা কর্তৃত্ব) কোনটাকেই স্বীকার করো না। তুমি ভোক্তা নও, কর্তা নও—শুধু দ্রষ্টা।

গীতা কিন্তু ভোগ আর কর্মকে জীবন থেকে ছেঁটে ফেলেননি। গীতার লক্ষ্য হল, সর্বতোভাবে পরমপুরুষের অনুসরণ করা, সব জেনে-বুঝে তদ্‌ভাবে ভাবিত হওয়া (১৩।১৮)। পরম-পুরুষ দ্রষ্টা বা 'অধ্যক্ষ' (৯।১০)—উপনিষদের ভাষায় বিশ্বাতীতে দেখছেন নিজের অমূর্ত রূপকে, বিশ্বে নিজেরই আত্মরূপায়ণকে। দেখার একটা স্বারসিক আনন্দ আছে। দেখছি তটস্থ হয়ে, দৃশ্যের সঙ্গে না জড়িয়ে গিয়ে। এই যে নিজেকে বিবিক্ত রাখতে পারছি, তাতেই আপনাকে যেন নিবিড় করে পাচ্ছি। তখনকার যে 'বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়' সুখ, তা আত্মার অক্ষয় লাভ। তাকে পুঁজি করতে পারলে সংসারের গুরুতর দুঃখও আর আমায় বিচলিত করে না (৬।২০-২২)। দুঃখসংযোগের মধ্যেও এই যে দুঃখ-বিয়োগের অনুভব, গীতা তার নাম দিয়েছেন 'যোগ' (৬।২৩)। নীচে থেকে দেখতে গেলে তা দুঃখাভাব, কিন্তু উপর থেকে দেখলে তাই আত্যন্তিক সুখ (৬।২১)।

এমনি করে দ্রষ্টৃত্বের সঙ্গে ভোক্তৃত্ব জড়িয়ে আছে এক বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সুখের আস্বাদনে। এই ভূমিতে থেকে

দ্রষ্টার কাছে এক অপ্রাকৃত কর্তৃত্বের বোধও স্ফুরিত হয়। কি করে, তা গীতা বিবৃত করছেন এই ভাবে। বিবৃতিটি ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মভূত জীব (৬।২৭, আরও তু. ৫।২৪, ১৮।৫৩-৫৪) উভয়ের বেলায় সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে ব্যাপারটা যোগচেতনার ক্রমিক উন্মেষের দিক থেকে বুঝতে পারলেই তার তাৎপর্য সুগম হবে।

প্রথমত পুরুষ 'উপদ্রষ্টা'—যেন প্রকৃতি হতে বিবিক্ত, তটস্থ এবং উদাসীন (তু. ৯।৯, ভগবান কর্মে অসক্ত এবং উদাসীন; ১৪।২৩, ১২।১৬)। কিন্তু দেখতে-দেখতে চিত্তে যখন রসের দোলা লাগে, পুরুষ তখন দ্রষ্টা আর দৃশ্য থেকে নিজেকে আলাদা রাখবার কোনও প্রয়োজন বোধ করেন না। রসচেতনাই তখন দ্রষ্টা আর দৃশ্যের মধ্যে যে এক সামরস্যের সূচনা করে—এটি অনুভবসিদ্ধ। পুরুষ তখন প্রকৃতির খেলায় স্বচ্ছন্দে যোগ দিতে পারেন, তার খেলার স্বাতন্ত্র্যে তাঁর পূর্ণ অনুমোদন থাকে, যেন 'তুমি যা খুসি তা করে যাও, আমার দেখতে বেশ লাগছে'—ভাবখানা এইরকম। উপদ্রষ্টা পুরুষ তখন 'অনুমন্তা'।

এর পরিপাকে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়। তখন প্রকৃতির কর্মে যে-পারার্থ্য অর্থাৎ পুরুষের ভোগাপবর্গ-সাধনের যে-তৎপরতা, তার রীতিনীতি পুরুষের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুরুষ বুঝতে পারেন, প্রকৃতি-পরিণামের চরম লক্ষ্য কি। সে-লক্ষ্যের মূলে যে-ঋতচ্ছন্দ, তাকে তিনি এক সত্যসঙ্কল্পেরই অভিব্যঞ্জনা-রূপে দেখতে পান। কিন্তু তত্ত্বত পুরুষই বিশ্বচিৎ, অতএব সঙ্কল্প তাঁরই। তাইতে প্রকৃতি-পরিণামের তিনি 'ভর্তা'। প্রকৃতির সমস্ত কর্ম চলছে তাঁরই অনুমোদনে এবং বিধৃতিতে। প্রকৃতি পুরুষেরই স্বার্থসাধিকা।

সুতরাং এ-প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতি নয়, পুরুষের পরা এবং পরমা বা স্বীয়া প্রকৃতি। তার সঙ্গে অবিবেকের কোনও কথাই ওঠে না। আর তাইতে পুরুষ প্রকৃতির 'ভোক্তা মহেশ্বর'। ভোক্তৃত্বে

তাঁর আনন্দ আর ঐশ্বর্যে তাঁর শক্তির প্রকাশ। এইভাবে পুরুষ যখন প্রকৃতির সমস্ত ব্যাপারের 'উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর', তখন সেই পরমপুরুষকেই বলা হয় 'পরমাত্মা' বা 'পুরুষোত্তম' এবং এই দেহেই তাঁর বিগ্রহবত্তা অনুভূত হয় (১৩।২২, ১৫।১৭ ; তু. অধিযজ্ঞ পুরুষ ৮।৪)। উপনিষদে এই হিরণ্ময় পুরুষের কল্যাণতম রূপের কথা আছে, অথচ তিনি রূপের অতীত একথাও আছে (ঈ. ১৬, ছা. ১।৬।৬-৭ ; ক. ২।৩।৯, শ্বে. ৪।২০)। আবার তিনি যে বিশ্বরূপ, একথা বেদেও আছে। গীতায় এই তিনটি ভাবনারই সমাহার পাওয়া যায়, আগেই বলেছি।

পরমাত্মা বা পুরুষোত্তমরূপেই তাহলে ক্ষেত্রজ্ঞের পরম পরিচয়। তাঁর ক্ষেত্র তখন পিণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ড দুইই।

প্রশ্ন

'ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা। অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে' (১৩।২৪)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে আত্মসাক্ষাৎকারের পথ একটি নহে। পূর্বজন্মের সংস্কারের ফলেই কি পথের বিভিন্নতা সৃষ্টি হয় ?

উত্তর

দেখা যাচ্ছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্তরে-বাইরে চরাচররূপে যা-কিছু সমস্তই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হতে সঞ্জাত (১৩।২৬)। ক্ষেত্রজ্ঞরূপী পরমপুরুষের অধ্যক্ষতাতেই ক্ষেত্ররূপিণী প্রকৃতি সচরাচর জগৎ প্রসব করছেন (৯।১০ : তু. ১৪।৩-৪)।

মাতৃগর্ভে ভ্রূণের মত ব্রহ্মযোনিরূপ ক্ষেত্রে আমরা নিবদ্ধ হয়ে রয়েছি (১৪।৪-৫), নিজের অন্তরে বা বাইরে ভূতমহেশ্বর সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে জানতে পারছি না। এই ক্ষেত্রজ্ঞকে জানতে হবে, জানতে হবে প্রকৃতি এবং তাঁর গুণলীলা। জেনে, উপনিষদের ভাষায় 'যোনিমুক্ত' হতে হবে (শ্বে. ১।৭)। এই আমাদের পরমপুরুষার্থ (তু. ১৩।২৩)।

মুক্তির উপায় হচ্ছে বিবেকজ্ঞান। মাতৃগর্ভ হতে বেরিয়ে এসে মা থেকে আলাদা হয়ে দেখতে হবে মায়ের মুখ, দেখতে হবে বাবার মুখ। জানতে হবে গুণলীলাময়ী প্রকৃতিকে এবং তাঁর 'ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর' পুরুষকে। এই হল জ্ঞানচক্ষু দিয়ে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের তফাতটুকু জানা (১৩৷৩৪)।

এই জানার কয়েকটি উপায়ের কথা ভগবান্ বলছেন এখন।

প্রধানত জানার তিনটি উপায়—সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ আর উপাসনাযোগ (১৩৷২৪), কিন্তু সব যোগেরই মুখ্য অঙ্গ হচ্ছে ধ্যান বা অন্তর্মুখ চিত্তের একতানতা। জ্ঞেয় বস্তুকে বাইরে রেখে জানা হল পরোক্ষ জ্ঞান—তাতে বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান হয় না। তত্ত্বজ্ঞান হয় অপরোক্ষ জ্ঞানে—যখন বাইরের বস্তুকে ভিতরে টেনে এনে তার সঙ্গে তদাত্মক হয়ে গিয়ে তাকে জানি—মা যেমন গর্ভস্থ সন্তানকে জানে তার সঙ্গে একাকার হয়ে আবার তাকে ছাপিয়ে গিয়ে। পরোক্ষ জ্ঞানে একটা ত্রিপুটী আছে—জ্ঞাতা জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ের ত্রিপুটী। তার মধ্যে জ্ঞাতা আত্মা, কিন্তু জ্ঞেয় জ্ঞাতার বাইরে—কাজেই অনাত্মা। আর দুয়ের মধ্যে যে জ্ঞানা-শক্তির ব্যাপার, তার স্বরূপ দুয়ের মাঝামাঝি। জ্ঞান জ্ঞাতারই বৃত্তি, কিন্তু যখন সে বহিরাবৃত্ত, তখন অনাত্মভাবদ্বারা গ্রস্ত। ইন্দ্রিয়ব্যাপার দিয়ে যাকেই আমরা জানতে চাই, তাকে কখনও পুরাপুরি জানতে পারি না—সে আমাদের অতি কাম্য হয়েও অনাত্মীয়ই থেকে যায়।

তত্ত্ব-জ্ঞানের জন্য চিত্তকে তাই অন্তরাবৃত্ত করতে হয়। জ্ঞেয়কে নিয়ে জ্ঞান তখন জ্ঞাতার মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকে। এ-অবস্থায় জ্ঞাতা জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সবই আত্মা। আমি তখন আমাকে দিয়েই তোমাকে জানছি আমি বলে—যেমন জানা যায় ভালবাসার বেলায়। চিত্ত তখন ধ্যানতন্ময়। এমনি করে ধ্যানের মাধ্যমে আত্মা দিয়ে আত্মাকে জানা আত্মাতে—সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানেরই সাধারণ লক্ষণ।

একই ধারায় শেষ পর্যন্ত সবাই একই বোধে পৌঁছয় বটে, কিন্তু তবুও এক জায়গা থেকে সবার যাত্রা শুরু হয় না। যেমন বৃত্তের পরিধি থেকে কেন্দ্রে যেতে হলে সবাইকে সরল রেখায় চলে একই কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হতে হবে, কিন্তু যাত্রাবিন্দুটি সবার এক নাও হতে পারে।

ভাবনা, ভাব আর সঙ্কল্প—চেতনার এই তিনটি মুখ্য বৃত্তি। সবার মধ্যে তিনটি ওতপ্রোত হয়ে আছে, কিন্তু সংস্কারভেদে ওদের একটির প্রতি একেকজনের ঝোঁক হয়। তাইতে বেদে সাধনাকে জ্ঞান কর্ম এবং উপাসনা এই তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণও তাই করছেন—কিন্তু পারিভাষিক সংজ্ঞাগুলির অর্থ-ব্যাপ্তি ঘটিয়ে। যাদের মধ্যে জ্ঞানের সংস্কার প্রবল, তারা অনুশীলন করে সাংখ্যযোগের। যাদের মধ্যে কর্মের সংস্কার প্রবল তারা ধরে কর্মযোগের পথ। যাদের ভাব প্রবল, তারা হয় উপাসনাযোগী। জ্ঞানযোগ আর কর্মযোগের কথা দ্বিতীয় আর তৃতীয় অধ্যায়ে সবিস্তারে বলা হয়েছে। দ্বাদশাধ্যায়ে শ্রদ্ধাবান্ এবং একান্তী হয়ে 'ধর্মামৃতের পর্যুপাসনা'-রূপ ভক্তিযোগের কথাও বলা হয়েছে (তু. ১২।২০, ৬)। কিন্তু কোথাও একটি যোগের সঙ্গে আরেকটি যোগের বিরোধ ঘটানো হয়নি। সাংখ্যের সঙ্গে কর্মের বিরোধ নাই (২।৩৯…, ৫।৪-৫); কর্মের সঙ্গে ভক্তির বিরোধ নাই, (১২।৬, ১০); জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির বিরোধ নাই, কেননা নিত্যযুক্ত একভক্তি জ্ঞানীই তাঁর বিশিষ্ট ভক্ত (৭।১৭-১৯, ১২।১৯…)। অষ্টাদশ অধ্যায়ে স্পষ্টতই তিনটি পথকে মিলিয়ে দিয়ে ভগবান্ বলছেন, 'যাঁহতে সর্বভূতের প্রবৃত্তি, যিনি সব-কিছু ছেয়ে আছেন [এই বোধই জ্ঞান, তু. ২।১৭], নিজের কর্ম দ্বারা তাঁর অর্চনা করেই মানব সিদ্ধি লাভ করে' (১৮।৪৬)। এইটিই গীতার পরম অনুশাসন।

উপাসনাযোগকে শ্রৌতপথ বলা হয়েছে (১৩।২৫), এইটি লক্ষণীয়। উপনিষদে উপাসনার কথা বহুজায়গায় আছে। ঋষিপন্থা

হল দেবোপাসনার মাধ্যমে ব্রহ্মে পৌঁছনো। মুনিপন্থার মুখ্য সাধন হল আত্মবিচার, আত্মাকে প্রকৃতি হতে পৃথক্ করে জানা।

প্রশ্ন

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৩২, ৩৩, ৩৪ শ্লোকের রহস্যার্থ কি? জ্ঞান-চক্ষুকেই কি দিব্যদৃষ্টি বলা হইয়াছে গীতায়? ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদজ্ঞান হয় কিরূপে?

উত্তর

অধ্যায়ের শেষ তিনটি শ্লোকে জীবন্মুক্তের আত্মানুভবের বিবৃতি। তার ভিত্তি হল ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্র হতে পৃথক্ বলে জানা—অন্তরাবৃত্ত দৃষ্টির সহায়ে। এই দৃষ্টিই জ্ঞানচক্ষু। সর্বভূত প্রকৃতিরই পরিণাম অথবা বিকৃতি। আগেই বলেছি, এই ভূত-প্রকৃতিকে গীতায় অন্যত্র মহদ্ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মযোনি বলা হয়েছে। এই গর্ভাশয়ে আমরা রয়েছি ভ্রূণের মত। যোনিমুক্ত হয়ে তাথেকে বেরিয়ে আসাই আমাদের পুরুষার্থ।

এটি হতে পারে জ্ঞানের দ্বারা। গর্ভস্থ যে-ভ্রূণ, স্বরূপত সে বীজপ্রদ পিতার দ্বারা নিহিত চিদ্‌বীজ। ভ্রূণকে ছাপিয়ে মাতা, আবার মাতাকেও ছাপিয়ে পিতা। পিতৃচৈতন্য মাতাতে এবং ভ্রূণে আবিষ্ট। ভূত প্রকৃতি এবং পুরুষ—এই তিনের মধ্যে এমনিতর একটা অন্যোন্যসম্পর্ক আছে।

ভূত বা জীবের দেহ আছে। দেহটি প্রকৃতির অন্তর্গত। এইটি ক্ষেত্র। তাতে অনুস্যূত যে বিবিক্ত চৈতন্য, তা-ই পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র হতে ক্ষেত্রজ্ঞকে আলাদা করে জানলেই ভূত-প্রকৃতিমোক্ষ সম্ভব এবং তা-ই হচ্ছে পরাগতি (১৩।৩৪)।

শ্রীকৃষ্ণ বিবেকজ্ঞানের দুটি সুপ্রাচীন সঙ্কেতের কথা বলছেন। বেদে পুরুষকে আকাশ অথবা সূর্য বলা হয়েছে। আকাশ অরূপ,

আর সূর্য কল্যাণতম রূপ। আকাশ সূক্ষ্ম হয়ে সর্বত্র অনুস্যূত; কিন্তু কোথাও সে জড়িয়ে নাই। সবাই তার মধ্যে আছে, অথচ সে যেন কিছুর মধ্যেই নাই (তু. ৯।৪)। সূর্যও তেমনি সব-কিছুকে তার আলোতে ফুটিয়ে তুলছে, কিন্তু সেও আকাশের মত নির্লিপ্ত।

আত্মচৈতন্য আকাশের মত, সূর্যের মত। এই চৈতন্য দেহের সর্বত্র অস্তিত্ববোধরূপে অনুস্যূত—এখানে আকাশ তার উপমান। আবার দেহের সব-কিছুর সে উদ্ভাসক—তখন সূর্য তার উপমান। দেহ ক্ষেত্র আর এই ক্ষেত্র যে সমগ্র আধারের সংজ্ঞা, একথা প্রথমেই বলা হয়েছে (১৩।১-৬)।

উপনিষদে আকাশ-শরীরের কথা আছে, বেদে আছে সূর্যত্বচ্ হওয়ার কথা—ব্রাহ্মণে যা হয়েছে হিরণ্যশরীর, উপনিষদে যোগাগ্নিময় শরীর। ক্ষেত্রকে বাদ দিয়ে নয়, সদ্ভাব এবং চিদ্ভাব দ্বারা তাকে আবিষ্ট এবং উদ্দ্যোতিত করে তাকে ছাপিয়ে যাওয়া—এই হল ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের বিবেক-সিদ্ধির মহনীয় রূপ। এ-বিবেক পরমাত্মার সহজ ধর্ম—যাতে তিনি প্রকৃতিকে ছাপিয়ে থেকেও তার 'অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর'।

তাঁর কথা আগের কয়েকটি শ্লোকে বলা হয়েছে (১৩।২৬-২৯): পরমেশ্বর 'সমভাবে' সর্বভূতে অবস্থিত; ভূতেরা বিনশ্বর, কিন্তু তিনি অবিনশ্বর। এই ভূতগ্রামের যে-প্রকৃতি, তার সঙ্গে তিনি নিত্য সংযুক্ত। সেই সংযোগ হতেই বিসৃষ্টি বা প্রকৃতির পরিণাম। এই সংযোগে তিনি প্রকৃতির কুক্ষিগত হয়ে তাতে নিঃশেষিত হচ্ছেন না, তাকে ছাপিয়ে রয়েছেন। অতএব তিনি যুগপৎ সংযুক্ত এবং বিবিক্ত—সর্বত্র।

তাঁকে এইভাবে জানাই হল জ্ঞান-সিদ্ধির চরম যার ইশারা পরের অধ্যায়ের গোড়াতেই আছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রশ্ন

'জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্' (১৪।১) কি? যে জ্ঞান আশ্রয় করিয়া ভগবৎ-সাধর্ম্য প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই জ্ঞান কিরূপ? সাধর্ম্য এবং সাযুজ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর

এই অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞানেরই অনুবৃত্তি চলছে। ক্ষেত্র প্রকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। উভয়ের তত্ত্ব জানতে হবে বিয়োগ এবং সংযোগ দুদিক থেকেই। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হতে চরাচর সত্ত্বের উৎপত্তি (১৩।২৬)। চরাচর তখন ক্ষেত্র বা প্রকৃতির অন্তর্ভূত, আর ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বর (১৩।২৭) তার ঊর্ধ্বে। পুরুষ যেমন প্রকৃতির ঊর্ধ্বে, তেমনি তিনি আবার প্রকৃতিস্থও বটে (১৩।২১)। এই পুরুষ তখন বদ্ধও হতে পারেন, মুক্তও হতে পারেন। বদ্ধ অবস্থায় তাঁর মধ্যে মুমুক্ষা জাগে। মুক্তির উপায় প্রকৃতি হতে বিযুক্ত হওয়া। কিন্তু পরমপুরুষ নিত্যমুক্ত থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযুক্ত। প্রকৃতিস্থ হয়েও তিনি প্রকৃতির ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর। অতএব যুগপৎ যুক্ত এবং মুক্ত—এই তাঁর মুক্তির রহস্য।

মুমুক্ষু পুরুষ যোগে যখন আরুরুক্ষু (৬।৩), তখন তিনি অপরা প্রকৃতি থেকে তফাত হয়ে পরা প্রকৃতির অনুসরণ করেন। তাঁর মধ্যে তখন বিবেকের ভাবনাই প্রবল। অথচ তিনিও দেখতে পান, পরমেশ্বর বা পরমপুরুষ সর্বভূতস্থ হয়েও সর্বভূতের অতীত—কেননা ভূতেরা বিনশ্বর, কিন্তু তিনি অবিনাশী (১৩।২৭)। আরুরুক্ষু পুরুষ যোগারূঢ় হলে এই ভাবটি তাঁর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়—তিনি সর্বত্র ঈশ্বরকে 'সমভাবে' সমবস্থিত দেখতে পান এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্যহেতু সর্বত্র তাঁর আত্মদর্শন হয়। তখন সবই যখন তাঁর আত্মা, তখন কারও সঙ্গে তাঁর কোনও বিরোধ হয় না। এইটি

তাঁর পরা গতি অর্থাৎ সাধনার চরমভূমি লাভ (১৩।২৮)। যেমন একই সূর্যবিম্ব হতে সূর্যরশ্মিরা দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি একই অক্ষর এবং মহৎ ব্রহ্ম হতে পৃথক্-পৃথক্ ভূতের বিসৃষ্টি দর্শন করে তিনিও ব্রহ্মভূত হন (১৩।৩০)। আবার এ তাঁর হয় এই দেহেই। দেহ ক্ষেত্র, আত্মা তাতে ক্ষেত্রজ্ঞ। এই আত্মাতে তিনি অনুভব করেন সর্বভূতাত্মভূতাত্মা পরমাত্মাকে (তু. ৫।৭)। সবার মধ্যে থেকেও তিনি তখন নিজেকে অনুভব করেন স্বরূপত অনাদি অব্যয় নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় এবং প্রকৃতির গুণ-ক্রিয়ার সংস্পর্শে এসেও ('শরীরস্থ' হলে এই স্পর্শযোগটুকু অনিবার্য) নির্লিপ্ত (১৩।৩১)।

এই অবস্থাতে তাঁর ব্যবহার কিন্তু নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু বিবেক-জ্ঞান অবিপ্লুত থাকায় তিনি দেখেন, যা-কিছু করবার তা প্রকৃতিই করছে, কিন্তু তিনি স্বয়ং অকর্তা (১৩।২৯)।

এই জ্ঞান ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের অন্তর বা বিভাগ বা বিয়োগের জ্ঞান এবং তার ফল ভূত-প্রকৃতি হতে মুক্তি (১৩।৩৪)। ভূত-প্রকৃতিও ক্ষেত্র, কিন্তু শ্রীক্ষেত্র নয় অথবা অবিমুক্ত কাশীক্ষেত্র নয়—এই কথাটি স্মরণে রাখতে হবে।

লক্ষণীয়, এই প্রসঙ্গে পরা গতির তিনটি বিভাব বিবৃত হয়েছে—পরমপুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞকে পরমেশ্বর পরব্রহ্ম এবং পরমাত্ম-রূপে অনুভব করা। এগুলি একই অদ্বয় তত্ত্বজ্ঞানের তিনটি প্রকার (তু. ভাগবত ১।২।১১, তত্র 'ভগবান্' পরমেশ্বর)।

কিন্তু এই জ্ঞান ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগের জ্ঞান, সংযোগের জ্ঞান নয়। এখানে চেতনার গতি ঊর্ধ্বমুখী। পুরুষ প্রকৃতির উপদ্রষ্টা, বড় জোর অনুমন্তা। এই হল পরমপুরুষের সঙ্গে সাযুজ্য অর্থাৎ লোকোত্তরে তাঁর সঙ্গে একাত্মতা।

কিন্তু তিনি যেমন লোকোত্তর, তেমনি আবার লোকাত্মকও—'পুরুষ এব ইদং সর্বম্' (ঋ. ১০।৯০।২)। তখন তিনি প্রকৃতির

সঙ্গে সংযুক্ত। এই সংযোগ কি ধরনের, তা পরের শ্লোক দুটিতে (১৪।৩-৪) বিবৃত হয়েছে। এই সংযোগের জ্ঞানই হল 'জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্', যেমন 'উত্তম জ্ঞান' হচ্ছে তাঁর মানুষী তনুতে পরম ভাব এবং ভূতমহেশ্বর ভাবকে উপলব্ধি করা (৯।১১)। এই জ্ঞানকে আশ্রয় করতে পারলেই তাঁর সমধর্মা হওয়া যায়। সাযুজ্যে মুক্তি, আর সাধর্ম্যে সিদ্ধি (১৪।১) অর্থাৎ পরমেশ্বরের ভর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব এবং ঐশ্বর্যের শরিকানা লাভ করা। কিন্তু এই বিশ্বাত্মকতায় এবং বিশ্বোত্তীর্ণতায় কোনও বিরোধ নাই। মুনি সৃষ্টি-প্রলয়ের ঊর্ধ্বে থেকেই তাঁর সঙ্গে সৃষ্টি-প্রলয়ে স্বচ্ছন্দে দোল খান (১৪।২)।

প্রশ্ন

'তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা' (১৪।৪)—আদি পিতা-মাতার সৃষ্টি কি ক্রিয়াপর, না ইচ্ছামাত্র? সর্বভূতের সম্ভাবনা-বীজ কিরূপ? বীর্য এবং রজের সম্মিশ্রণ না হইলে সৃষ্টির সম্ভাবনা হয় কিরূপে? মানস-সৃষ্টি এবং প্রাকৃত-সৃষ্টিতে পার্থক্য কি? আদি বীজপ্রদ পিতার ভাবই তো প্রাকৃত-জগতে পিতার মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে?

উত্তর

অক্ষর ব্রহ্ম বীজপ্রদ পিতা আর মহদ্ ব্রহ্ম যোনিরূপা মাতা। বীজ-বিসৃষ্টি হল বেদের ভাষায় অক্ষরের ক্ষরণ, যা বিশ্বের উপজীব্য (ঋ. ১।১৬৪।৪২)। তিনি ক্ষরিত হয়েও অক্ষরই থাকেন—শতধারায় প্রবাহিত হয়েও অক্ষীয়মাণ উৎসের মত (তু. ঋ. ৩।২৬।৯)। তাইতে বেদে বলা হয়েছে তাঁর একপাদ সর্বভূত, আর ত্রিপাদ দ্যুলোকে অমৃত—এমনি করে তিনি চতুষ্পাৎ অর্থাৎ চারপোয় পূর্ণ পুরুষ (ঋ. ১০।৯০।২-৩)। উপনিষদে সন্ধাভাষায় তাই বলা হয়েছে, 'ওই পূর্ণ, এও পূর্ণ, পূর্ণ থেকে পূর্ণ উপচে পড়ছে; আর পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিয়ে গেলেও তবু পূর্ণই থেকে যাচ্ছে (বৃ. ৫।১।১)।'

এইটি ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের দিব্যসংযোগ, যার জ্ঞান উভয়ের বিবেক-জ্ঞানেরও বাড়া বলে 'উত্তম জ্ঞান'। এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ 'পুরুষোত্তম', আর তাঁর প্রকৃতি 'স্বা প্রকৃতি' এবং 'আত্মমায়া'। ওই পরমা প্রকৃতিকে আশ্রয় করে তাঁর যে 'সম্ভব' বা 'আত্মবিসৃষ্টি' বা 'দিব্য জন্ম' (এবং 'দিব্য কর্ম'), পুরাণে তাকেই বলা হয়েছে তাঁর 'অবতারকথা শুভা' (৪।৬-৯)।

তিনিই যে জীব-জগৎ হচ্ছেন অর্থাৎ চিৎ থেকে জড় পর্যন্ত নেমে আসছেন, এই হল তাঁর সার্বভৌম আদ্য অবতার। বেদ বলছেন, সৃষ্টির আদিতে তিনি আপনাতে আপনি অটল থেকে বিনা বাতাসে নিঃশ্বাস ফেললেন। এই নিঃশ্বাস ফেলাটাই তাঁর কাম বা 'মনসো রেতঃ' অর্থাৎ মনোবীর্যের উৎসরণ, আর তাহতেই 'বিসৃষ্টি' (ঋ. ১০।১২৯।২,৪,৬ সারসংক্ষেপ)। কাম বা ইচ্ছাই সৃষ্টির প্রবর্তক। উপনিষদে তার রূপ 'অহং বহু স্যাম্, প্রজায়েয়'—আমি বহু হব, প্রজাত হব। এই ইচ্ছা ক্ষেত্রজ্ঞপুরুষের 'মায়া' কিনা প্রজ্ঞান। আর ইচ্ছা বা কাম যাতে সক্রিয় হয়ে অমূর্তকে মূর্ত করে, তাই তাঁর ক্ষেত্র বা প্রকৃতি—এখানে যাকে বলা হয়েছে 'মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম' (১৪।৩)। পরমপুরুষের 'মনসো রেতঃ' মহদ্ ব্রহ্মে আহিত হয়ে তার রূপকৃৎ শক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করে। ওই রূপকৃৎ শক্তিই প্রকৃতির রজঃ। বেদে এই প্রকৃতিকে বলা হয়েছে 'গৌরী' বা মধ্যমা বাক্—যিনি 'বভূবুষী' কিনা বহু হবার ইচ্ছায় কোষবিভাজনের মত নিজেকে ভেঙে-ভেঙে চলেন (তু. ঋ. ১।১৬৪।৪১)।

পরমব্যোমে এই হল ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের দিব্যসংযোগ, প্রাকৃত পিতা-মাতার সন্তানসৃষ্টিতে যার অনুকৃতি চলছে। তবে অপ্রাকৃত গর্ভাধান সম্পূর্ণ সজ্ঞান এবং স্ববশ এবং প্রকৃতি পুরুষেরই যোনি অতএব দুয়ে ভেদ নাই (১৪।৩) ; আর প্রাকৃত প্রজোৎপাদনে ব্যাপারটা ঘটে অজ্ঞানে এবং অবশে—দুয়ে এই তফাত। কিন্তু প্রাকৃত ব্যাপারেও পরমপুরুষের প্রজ্ঞান অন্তর্যামিরূপে অনুস্যূত থাকে এবং তা-ই হয়

জীবের উৎক্রান্তির প্রয়োজক। কখনও-কখনও স্বেচ্ছায় এবং স্বজ্ঞানে এই জীব-লীলায় নেমে আসেন যুগসন্ধিতে। তখন তিনি অবতার এবং তাঁর জন্ম এবং কর্ম দুইই দিব্য—যার অনুধ্যানে আমরাও যোনিমুক্ত হতে পারি (৪।৫, ৭-৯)।

প্রশ্ন

'সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে। জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥' (১৪।১১) এই শ্লোকটির রহস্যার্থ কি? সর্বদ্বারে প্রকাশ কিরূপ? ইন্দ্রিয়দ্বারে সত্ত্বগুণের বিবৃদ্ধি হয় কি উপায়ে? প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় কি সত্ত্বগুণের প্রকাশক হইতে পারে?

উত্তর

যেমন ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে জানতে হবে, তেমনি জানতে হবে তাঁর ক্ষেত্র প্রকৃতিকেও। প্রকৃতির স্বধর্ম হল গুণলীলা। এই লীলাকে জেনে তার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, গুণের মধ্যে থেকেও গুণাতীত হতে হবে—তাই হল আমাদের পুরুষার্থ (১৪।১৯-২০)। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞানকে পূর্ণ করবার জন্যে এই অধ্যায়ে গুণলীলা একটু বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে।

গুণ শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে দড়ি—যা দিয়ে বাঁধা যায়। পুরুষ স্বরূপত অজ এবং অব্যয় (তু. ৪।৬)। কিন্তু তিনি যখন দেহধারণ করলেন, তখন জন্ম-মৃত্যুর বিপাকে বাঁধা পড়লেন। তাঁকে বাঁধল সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ—এই তিনটি গুণ, যারা সৃষ্টির আদিতে প্রকৃতি হতে সম্ভূত (১৪।৫)।

গুণের সংজ্ঞা থেকেই বোঝা যায়, এ-প্রকল্পটি এসেছে সূর্যের উদয়াস্ত থেকে। সূর্যোদয়ের আগে অন্ধকার, তা-ই 'তমঃ'। সূর্য যখন উঠি-উঠি করছে, তখন পুবের আকাশ লাল হয়ে যাচ্ছে, তা-ই 'রজঃ'। অবস্থাটা আলো-আঁধারির মাঝামাঝি (তু. ১৪।১৮)। তারপর সূর্য উঠলে পর যা অন্ধকারে অসৎকল্প ছিল, তা যেন সত্তা পেল। তা-ই 'সত্ত্ব'।

তিনটি গুণ কেবল বাঁধন পরায় না, বাঁধন খোলেও। অহোরাত্রের আবর্তন দিয়ে বৈদিক ঋষিরা এই ভাবটি সুন্দর বুঝিয়েছেন। মধ্য রাত্রের পর থেকেই বলা যেতে পারে আলোর অভিযান শুরু হয়ে যায়। অন্ধ-তমিস্রা পার হয়ে ভোরের দিকে ফোটে উষার রক্তরাগ। তারপর সূর্যের উদয়, তার আলোর ক্রমিক উপচয়, অবশেষে মধ্যদিনে সূর্য যখন বিষ্ণুপদে, তখন পরিপূর্ণ আলোর প্রকাশ। তারপর থেকেই আবার আলো কমতে থাকে, সন্ধ্যায় মিলিয়ে যায়, রাত্রে আঁধার গভীর হয়ে আসে। আবার মধ্যরাত্রের পর আঁধারকে পরাভূত করে শুরু হয় আলোর জয়যাত্রা। এমনি করে দিনের পর দিন আলো-আঁধারের একটা চক্রাবর্তন চলছেই।

এর মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক পক্ষপাত আলোর প্রতি। আলো আমাদের প্রাণ, আমাদের প্রজ্ঞা—এটি একটি বৈদিক ভাবনা (তু. ঋ. ১।১১৩।১৬)। অন্ধকার থেকে আলো ফুটছে, আমরা আনন্দে ভেসে চলেছি তার জোয়ারে। কিন্তু ভাটার টানে আবার অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি। তবুও সে-অন্ধকার ভেদ করে আবার আমরা উত্তীর্ণ হচ্ছি আলোর কূলে।

সাংখ্যকার দেখালেন আলো-অন্ধকারের এই ঝুটোপুটি জীবনের সর্বত্র। রজঃশক্তি যেন সত্ত্ব আর তমের মধ্যে ক্রমাগত মাকু ঠেলে চলেছে। তাইতে তিনটি গুণ সবসময় ওতপ্রোত হয়ে আছে আমাদের মধ্যে—একেকসময় একেকটি জোর ধরছে আর দুটিকে দাবিয়ে রেখে (১৪।১০)। অন্তঃপ্রকৃতিতে কখনও তামসিক জড়ত্ব, কখনও রাজসিক চাঞ্চল্য, কখনও সাত্ত্বিক প্রকাশ জয়ী হচ্ছে—কিন্তু নির্ভেজাল নয় বলে কেউ স্থায়ী হতে পারছে না।

প্রকৃতির আসল লক্ষ্য কিন্তু গুণবদ্ধ পুরুষকে শুদ্ধসত্ত্বে উত্তীর্ণ করা—তামসিক মোহ আর রাজসিক কর্মচাঞ্চল্য হতে তাঁকে মুক্ত ক'রে। সত্ত্বগুণের ধর্ম হচ্ছে প্রকাশ, রজোগুণের ধর্ম উপরাগ, আর তমোগুণের মোহ (১৪।৬-৮)। আলোর উপমা দিয়ে বলতে গেলে,

সত্ত্বগুণ হল যেন রংছুট শুভ্র আলো, রজোগুণে আলোতে নানা রঙের খেলা, আর তমোগুণে আলো যেন আবছা হতে-হতে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

আবার শুভ্র আলো বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতীক। সে-আলোতে বস্তুর স্বরূপ অবিকৃতভাবে প্রকাশ পায়। তাতে কোনও মতলবের রং মাখানো থাকে না। তত্ত্বের স্বচ্ছ প্রকাশে চিত্ত প্রসন্ন হয়। সত্ত্বগুণে তাইতে চিত্তে ব্রহ্মের চিৎস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপের স্ফুরণ হয়। কিন্তু সাবধান থাকতে হবে, এই জ্ঞান আর সুখের স্ফুরণেও কোথাও যেন আসক্তি না থাকে। তাহলে সত্ত্বগুণে রজোগুণের ভেজাল ঢোকায় তা বন্ধনের কারণ হবে (১৪।৯,৬,৭)। এই ভেজালটুকু ধরা খুব কঠিন। জ্ঞান আর সুখ, চিৎ আর আনন্দ আত্মার স্বরূপ। স্বরূপের স্ফুরণ হবে অনায়াসে—আবরণভঙ্গের ফলে। তাইতে জ্ঞান আর সুখ যতক্ষণ পর্যন্ত সাধনলভ্য, আসক্তি বা কামনা তাদের প্রয়োজক—অতএব তারা বিশুদ্ধ নয়।

এইজন্য শুদ্ধসত্ত্বকে পেতে হলে নিস্ত্রৈগুণ্য ভূমিতে যেতে হয়। সেখান থেকে অনায়াসে শুদ্ধসত্ত্বের স্ফুরণ হয় পুরুষের স্বধর্মরূপে। উপনিষদে এটি আকাশ আর আদিত্যের উপমা দিয়ে বোঝানো হয়েছে। হিরণ্ময় পুরুষের সামনে শুক্লভাতি, আর পিছনে পরঃ-কৃষ্ণের নীলিমা। অর্থাৎ তিনি আকাশ আর আদিত্যের সমাহার। আকাশ অবর্ণ, আর আদিত্য সর্ববর্ণের সমাহার। এইটি শুদ্ধসত্ত্বের স্বরূপ—কেননা মাধ্যন্দিন আদিত্যে বিন্দুমাত্র অন্ধকারের সম্ভাবনা নাই, কোনও রঙের খেলাও নাই। অথচ সমস্ত রং উৎসারিত হচ্ছে ওই শুভ্রতা হতে। এই শুভ্রতা আমাদের মধ্যে পুরুষের জীবভূতা পরা প্রকৃতি, আর তাঁর মধ্যে 'স্বা প্রকৃতি' 'আত্মমায়া' বা যোগ-মায়া। এই শুদ্ধসত্ত্বের ধারণা না হলে গীতোক্ত গুণাতীতের লক্ষণটি (১৪।২২) বোঝা যায় না। গুণাতীতের মধ্যেও গুণসাম্য আছে—পুরুষের গুণসাম্য। সত্ত্ব তখন বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা, রজঃ অবিকম্প বীর্য

(তু. ২।৩১), আর তমঃ অক্ষুব্ধ প্রশান্তি। গুণাতীতের এই গুণসাম্যে কোনও গুণের সঙ্গে কোনও গুণের বিরোধ নাই। বেদের ভাষায়, আকাশে গুণাতীত পুরুষের 'অতিস্থিতি' আর আদিত্যে তাঁর 'বিশ্বতোবৃতি' (ঋ. ১০।৯০।১)। আকাশে তিনি অতনু, আদিত্যে সত্ত্বতনু।

এই পুরুষকে এই দেহেই পরমাত্মরূপে ধ্যানের ফলে তিনি আমাদের আত্মভাবস্থ হয়ে হৃদয়ে যে ভাস্বর জ্ঞানদীপটি জ্বালিয়ে তোলেন (১০।১১), তাতেই তাঁর আলো ইন্দ্রিয়পথে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। জ্ঞানী ভক্তের দেহ তখন দক্ষিণামূর্তির বিগ্রহের মত—শঙ্কর যার উপমা দিতে গিয়ে বলেছেন, বটগাছের গুঁড়িটা যদি ফাঁপা আর ঝাঁঝরা হয়, তখন তার মধ্যে প্রদীপ জ্বালালে যেমন হয় তেমনি।

তখন প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় বাহ্যস্পর্শেও ব্রহ্মেরই প্রকাশক। অন্তরে-বাইরে তখন সব আলো—এ যেন আলোয় আলো দিয়ে আলোকে দেখা। একেই উপনিষদে বলা হয়েছে ভূতশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের আপ্যায়ন বা মানুষী এবং দৈবী সমাজ্ঞা।

প্রশ্ন

গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের ২৬, ২৭ শ্লোক দুইটির রহস্যার্থ কি? 'ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আমি'—ইহারই বা নিগূঢ় তাৎপর্য কি? জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়ের ইঙ্গিত নাই কি শেষের শ্লোকটির মধ্যে? ভক্তিপথেও গুণাতীত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়। ভক্তিবাদ এবং জ্ঞানবাদে এত দ্বন্দ্ব কেন, উভয় পথে যদি একই লক্ষ্যে পৌছান যায়?

উত্তর

প্রকৃতি গুণময়ী, পুরুষ গুণভোক্তা। কিন্তু জীবের ভোগ আর ঈশ্বরের ভোগ একরকম নয়। জীব ভোগ করে গুণাধীন হয়ে, আর ঈশ্বর ভোগ করেন গুণাতীত এবং গুণাধীশ হয়ে। তিনি

ভোক্তা মহেশ্বর। তাঁর ভোগ রসোচ্ছল। আর জীবের ভোগ 'ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থ দ্বন্দ্বমোহে' সঙ্কুল বলে দুঃখময় (৭।২৭)। এই দুঃখের হাত হতে বাঁচবার জন্য তাকে গুণের ওপারে যেতেই হয় (তু. ১৪।২০)—এখন সে জ্ঞান বা ভক্তি যারই সাধনা করুক না কেন। গুণাতীতের লক্ষণ কি, তা ভগবান এখানে বিস্তৃত করেই বলেছেন (১৪।২২-২৫)। মনে হয়, লক্ষণটি জ্ঞানীর, তার পরেই তা ভক্তে উপচরিত হয়েছে (১৩।২৬)। কিন্তু লক্ষণীয়, ভক্তিযোগের বিবৃতিতে ভক্তের যে-লক্ষণ দেওয়া হয়েছে (১২।১৩-১৯), তা ভাবে এবং ভাষায় হুবহু এক।

ভক্তিযোগ আর জ্ঞানযোগের ভিত্তি তাহলে একই। সাধনার শুরুতে দুয়ের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে প্রাকৃত মনের বিকল্প। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এ-ভেদ থাকে না—যদি সংস্কারমোহে তাকে আমরা জিইয়ে না রাখি।

দর্শনের বিচারে জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে এই ভেদাভাসের একটা হেতু দেখানো যেতে পারে। পুরুষের ধর্ম 'স্বধা' বা আত্মপ্রতিষ্ঠা—তার প্রকাশ জ্ঞানে; আর প্রকৃতির ধর্ম 'স্বাহা' বা আত্মসমর্পণ—তার প্রকাশ ভক্তিতে। সাংখ্যে পুরুষের স্বরূপাবস্থান এবং প্রকৃতির পারার্থ্যের কথা আছে। তারও ওই তাৎপর্য। আবার চৈতন্য অনিমেষ, কিন্তু শক্তির উন্মেষ-নিমেষ আছে। এই দৃষ্টিতে শক্তি চৈতন্যের আশ্রিত। তাইতে পুরুষের কৈবল্য প্রকৃতির বিভূতির পরিচায়ক।

কিন্তু এসব বিচার বিভজ্যবাদের ফল। অখণ্ড দৃষ্টিতে পুরুষ-প্রকৃতি যুগনদ্ধ। তাইতে আমাদের মধ্যে উভয়ের ধর্মের অন্যোন্য-সংক্রমণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। কাজেই পরমার্থত জ্ঞান আর ভক্তিতে কোনও বিরোধ থাকতে পারে না। শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধা ভক্তি স্বরূপত উভয়েই গুণাতীত। উভয়েই প্রাকৃত গুণলীলার উর্ধ্বে থেকে

তার ভর্তা। গীতায় দেখি, ভক্ত এবং জ্ঞানী উভয়েই 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে' (১৪।২৬ ; ১৮।৫৩, তা-ই 'নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা' ১৮।৫০)।

ব্রহ্ম যখন গুণাতীত, তখন তিনি 'অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম' (৮।৩)। কিন্তু অক্ষর থেকেই অক্ষরের ক্ষরণ হয়, একথা আগে বলেছি। তখন ব্রহ্মই 'ব্রহ্মযোনি' বা মহদ্ ব্রহ্ম। উপনিষদে এঁকে বলা হয়েছে 'আনন্দং ব্রহ্মযোনিঃ'। ক্ষর-লীলার প্রযোজক বলে এঁকে আমরা ক্ষরব্রহ্মও বলতে পারি। 'ব্রহ্ম' সংজ্ঞার মধ্যেই রয়েছে বৃহত্ত্বের অর্থাৎ ব্যাপ্তিচৈতন্যের ভাবনা। তাই অক্ষর বা ক্ষর উভয় স্থিতিতেই ব্রহ্ম সর্বগত, তাঁর মধ্যে রয়েছে বিস্তারের ভাব (৩।১৫, ১৩।৩০)। উপনিষদে এই বিস্তারকে বলা হয়েছে আদিত্যরশ্মির ব্যূহন। তার বিপরীত ধর্ম হচ্ছে তেজরূপে ওই রশ্মির সমূহন—যার পরিণাম আদিত্যমণ্ডল। এই মণ্ডলটি পরমাত্মভাবের প্রতীক, তাইতে গীতাতে বারবার পরমাত্মাকে দেহের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে (১৩।২২, ৩১, ৩২)। এই পরমাত্মভাব ব্রহ্মভাব হতে উত্তম, একথা পরেই বলা হবে (১৫।১৭)—এখানে ভগবান্ নিজেকে ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা বলে তা-ই সূচিত করলেন। ব্রহ্মে অক্ষর-ভাব এবং ক্ষর-ভাবের যে-দ্বৈত, তার সমাধান এই প্রতিষ্ঠাতে। পরমাত্মা বা পুরুষোত্তম (১৫।১৭-১৮) শুধু ক্ষর-বা শুধু অক্ষর-ব্রহ্ম নন, দুয়ের সমাহারে পূর্ণব্রহ্ম।

এখানে ব্রহ্মের বিশেষণগুলি প্রণিধেয়। অক্ষর-ব্রহ্মের পরিচয় হল, তিনি অব্যয় এবং অমৃত। 'অব্যয়'ও যা, 'অক্ষর'ও তা। বেদেও পেয়েছি, তাঁর লোকোত্তর ত্রিপাদ 'অমৃত'। সেই অক্ষরই আনন্দ হয়ে বিশ্বরূপে উছলে পড়লেন। এই তাঁর ক্ষরভাব। উপনিষদেও পাই, 'আনন্দরূপং ব্রহ্মণো যদ্ বিভাতি'—এই যে দিকে-দিকে প্রকাশ পাচ্ছে ব্রহ্মের আনন্দরূপ। আবার এই আনন্দ সৃষ্টিতে সার্থক হচ্ছে যজ্ঞে—একথা বেদে পাই। যজ্ঞের সেরা সোমযাগ বা আনন্দযজ্ঞ, সোম বেদে আনন্দতত্ত্ব। মানুষের জীবনব্যাপী এই আনন্দযজ্ঞকে

উপনিষদে বলা হয়েছে 'পুরুষ-যজ্ঞ' যার অনুশাসন শ্রীকৃষ্ণ ঋষি ঘোর আঙ্গিরসের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তাইতে এখানে ব্রহ্মকে তিনি বলছেন 'ঐকান্তিক সুখ' এবং 'শাশ্বত ধর্ম'। বেদের পুরুষ-সূক্তেই যজ্ঞকে বিশ্বের প্রথম ধর্ম বলা হয়েছে (ঋ. ১০।৯০।১৬)। ব্রহ্মচক্রের কথা বলতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন, 'ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্', 'তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্' (৩।১৪-১৫)।

বিশেষণগুলিতে সৎ চিৎ আনন্দ এবং শক্তিরূপে পূর্ণব্রহ্মের একটি সামগ্রিক পরিচিতি পাচ্ছি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রশ্ন

'ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্' (১৫।১) বলিয়া যে প্রথম হইতে পাঁচটি শ্লোক বর্ণনা করিয়াছেন ভগবান্, তাহার রহস্যার্থ কি? ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের পর ইহা কোন্ তত্ত্বের বিবৃতি?

উত্তর

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছিল, জগৎ ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হতে উৎপন্ন। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ, আর ক্ষেত্র প্রকৃতি। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। এই ত্রিগুণের পরিচয় এবং পুরুষ কি করে তার অতীত হয়ে আছেন—তা বলা হয়েছে চতুর্দশ অধ্যায়ে। সেখানে ক্ষেত্রজ্ঞ অক্ষর ব্রহ্ম, আর ক্ষেত্র মহদ্ ব্রহ্ম। একজন বীজপ্রদ পিতা, আরেকজন যোনিরূপা মাতা। কিন্তু দুটিতে অবিনাভূত বা যুগনদ্ধ—বেদের বৃষভ-ধেনু বা তন্ত্রের অর্ধনারীশ্বরের মত। এইখানে পুরুষোত্তমতত্ত্ব আভাসিত হয়েছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে তার বিবৃতি। এখানে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষোত্তম, আর ক্ষেত্র তাঁরই আত্মমায়া এবং স্বীয়া প্রকৃতি—যাকে অধ্যায়ের প্রথমেই 'অব্যয় অশ্বত্থ'-রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

বর্ণনাটি জটিল, ওতে কতকগুলি বৈদিক রূপকল্পের সমাহার আছে। বেদের আপ্রীসূক্তে আমরা 'বনস্পতি' নামে এক দেবতার উল্লেখ পাই। স্বরূপত এই দেবতা 'অগ্নি', অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ঊর্ধ্বমুখ প্রাণের শিখা—দুয়ে মিলে উপনিষদের 'প্রাণাগ্নি'। আবার বেদেই বনস্পতি সোমও। অগ্নি মানুষের মধ্যে দ্যুলোকাভিসর্পী চেতনার অভীপ্সা, আর সোম তার মধ্যে পরমপুরুষের অমৃত-আনন্দের নির্ঝরণ। আমাদের আধারে দুটিরই সমাবেশ—যেন আগুনের ধারা উজিয়ে চলছে, আর সোমের ধারা নীচে ঝরে পড়ছে।

বনস্পতির প্রতীক দিয়ে যদি দুটি তত্ত্বকে বোঝাতে হয়, তাহলে সাধারণ যে-কোনও বনস্পতি হবে অগ্নির প্রতীক, কেননা সে আগুনের মতই যেন মাটির তলা থেকে মাথা তুলেছে সূর্যের দিকে। কিন্তু সোম বোঝাতে তাহলে ওই গাছটিকেই উলটে নিতে হয়, যাতে তার ডালপালাগুলি নীচের দিকে নেমে আসে, আর মূল থাকে উপরের দিকে। মানুষের দেহও এমনিতর একটা ওলটানো গাছের মত— তার মাথাটা মূল, ধড়টা কাণ্ড, আর হাত-পা শাখা। পুরুষের এই বর্ণনা বেদে পাওয়া যায়, সিদ্ধদের চর্যাপদেও আছে। অগ্নি-সোমকে একই সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হলে একটি সোজা গাছের সঙ্গে একটি ওলটানো গাছকে জুড়ে দিতে হয়।

এখন কতকটা এইধরনের একটি বনস্পতি আছে—ঝুরিনামা বট। বেদে তার নাম 'নৈচাশাখ', বৌদ্ধ সাহিত্যে 'ন্যগ্‌-রোধঃ'—অর্থ, যার শাখা নীচের দিকে নেমে এসেছে।

উপনিষদে ওলটানো অশ্বত্থ গাছকে বলা হয়েছে ব্রহ্মবৃক্ষ (ক. ২।৩।১)। এখানেও ব্রহ্মবৃক্ষ ওলটানো অশ্বত্থ গাছ। সামবেদের গোভিলগৃহ্যসূত্রে ব্রহ্মবৃক্ষ কিন্তু বট গাছ। গীতার বর্ণনায় মনে হয়, অশ্বত্থ-কল্পনার সঙ্গে ন্যগ্রোধ-কল্পনা মিশে গেছে, কেননা প্রথম শ্লোকে অশ্বত্থকে 'ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ' বলে আবার পরের শ্লোকেই তাকে 'ঊর্ধ্বশাখ' এবং 'অধোমূল' বলা হয়েছে। গাছটি তখন বট, আর তার ঝুরিগুলি 'মূল', যা দেখতে শাখার মত। এও বলা চলে, তার শাখা অধঃ এবং ঊর্ধ্ব দুদিকেই প্রসৃত।

গীতোক্ত ব্রহ্মবৃক্ষের ঊর্ধ্বশাখাগুলি অশ্বত্থের—তারা অগ্নির শিখা। আর অধঃশাখাগুলি ন্যগ্রোধের—তারা সোমের ধারা। সোমের ধারা বেদে আবার 'অন্ধঃ'-রূপে পাতালবাহিনী। ন্যগ্রোধেরও দু'প্রস্থ মূল। এক তার ঝুরি—সেগুলিকে আমরা মাটির উপরে দেখতে পাই। আরেক প্রস্থ মূল গাছ আর ঝুরিগুলি হতে 'অনুসন্তত' বা অনুবৃত্ত কতকগুলি শিকড় যা মাটির ভিতর

সেঁধিয়ে গেছে। এইগুলিকে বলা হয়েছে 'মানুষের কর্মানুবন্ধ' বা কর্মপরম্পরা, যা সংসারস্থিতির কারণ।

ব্রহ্মবৃক্ষটির তাহলে তিন ভাগ। এক ভাগ তার ঝাঁকড়া মাথা —যা কতকগুলি পাতার সমষ্টি। আরেক ভাগ তার কাণ্ড; কিন্তু একটি কাণ্ড নয়—অগণিত কাণ্ড, যাতে একটি গাছই বহু গাছের একটি বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তৃতীয় ভাগ হল তার মাটির নিচেকার মূলের অরণ্য।

এই গাছটির বর্ণনা ঋক্‌সংহিতায় ঋষি শুনঃশেপের একটি বারুণ-মন্ত্রে পাওয়া যায় (১।২৪।৭)। সেখানে গাছটির ('বনস্থ' =বনের মত গাছ) মাথাকে বলা হয়েছে 'ঊর্ধ্বস্তূপ'—যা বোঝাচ্ছে আদিত্য-মণ্ডলকে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এটি হল আমাদের 'মূর্ধা,' যাকে অন্যত্র বলা হয়েছে 'ঊর্ধ্ববুধ্ন'। আর গাছের কাণ্ডগুলি (ঋ. তে 'নীচীনাঃ') হল আদিত্যের রশ্মিজাল ('কেতবঃ')। তারা এসে আমাদের মধ্যে 'নিহিত' বা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। তখন গীতার ভাষায়, তারা 'অধশ্‌চ মূলান্য.নুসন্ততানি কর্মা.নুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে'—যেন ওই গাছের শিকড়।

ব্রহ্মবৃক্ষের পাতাগুলি সূর্যের আলোয় ঝলমল করে কাঁপছে। গীতার ভাষায় ওরা হল 'ছন্দাংসি'। এই ছন্দগুলি বিশ্বের ঋতচ্ছন্দ বা সৃষ্টির পরিকল্পনা। একেই বলা হয় 'বেদ'। যেমন মাটির রস, তেমনি সূর্যের আলো—দুইই গাছের প্রাণ। দুয়ের সমাহার হয়েছে ওই পত্রগুচ্ছে।

এই অপরূপ ব্রহ্মবৃক্ষকে যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ বেদবিৎ (১৫।১; তু. 'বেদবিদ্ এব চা.হম্' ১৫)। এই ব্রহ্মবৃক্ষটি হল, সংসারবৃক্ষ বা পরমপুরুষের 'ক্ষেত্র', ('যোনিরূপ মহদ্ ব্রহ্ম,' 'আত্ম-মায়া' এবং 'স্বা প্রকৃতি'। এই প্রকৃতিতে তার আত্ম'গুণই' রসের যোগান দিচ্ছে এবং তা-ই গুচ্ছে-গুচ্ছে প্রকাশ পাচ্ছে ভোগ্য 'বিষয়' হয়ে (১৫।২)।

পুরুষের এই স্বীয়া প্রকৃতিই তাঁর মায়া। মায়া তাঁর প্রজ্ঞান-শক্তি, আর প্রকৃতি হল কৃতিশক্তি। এই মায়ার আদি নাই, অন্ত নাই। আবার নিত্যপরিণামিনী প্রকৃতি বলে তার সম্প্রতিষ্ঠা বা ধ্রুবাস্থিতিও নাই। অনির্বচনীয়া বলে তার এই রূপও সাধারণের উপলব্ধিতে আসে না (১৫।৩)।

ব্রহ্মবৃক্ষকে স্থিতির দিক থেকে বলা হয় 'অশ্ব-ত্থ'। এই শব্দটির আরেকটি রূপ হচ্ছে 'অশ্ব-ত্থামা'। বেদে 'অশ্ব' প্রাণ এবং ওজঃশক্তির প্রতীক ; আর 'স্থামন্' বোঝায় স্থিতিশক্তিকে।

প্রাণ নিত্যস্পন্দমান অথচ অবিনশ্বর বলেই সে 'অশ্বত্থামা' বা 'অশ্বত্থ'। গীতায় তাইতে তাকে বলা হয়েছে 'সুবিরূঢ়মূল' (১৫।৩)।

ব্রহ্মবৃক্ষটি অগ্নিরূপে 'অশ্বত্থ' আর সোমরূপে 'ন্যগ্রোধ'। জগৎ অগ্নি-সোমাত্মক। উপনিষদে একে ব্রহ্মচক্রও বলা হয়েছে। এ নিত্য আবর্তিত হয়ে চলেছে, সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও আবর্তিত হচ্ছি।

কিন্তু চক্রের আবর্তন লক্ষ্য হয় তার নেমিতেই—নাভিতে নয়। নাভিতে আছেন আদ্যপুরুষ, যিনি আবর্তনের ঊর্ধ্বে। তিনি বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির থেকেই তাতে নিত্যকাল ধরে গতিসঞ্চার করে চলেছেন (১৫।৪)।

গতি থেকে আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে স্থিতিতে—পরমপুরুষের পরমপদে। তার জন্য গতির হেতুভূত যে-ব্রহ্মবৃক্ষ, তার মূলচ্ছেদ করতে হবে অসঙ্গরূপ শস্ত্র দিয়ে। সাংখ্যের ভাষায় প্রকৃতি হতে পুরুষকে সম্পূর্ণ বিবিক্ত হতে হবে (১৫।৩-৪)।

এই বিবেক-সাধনের প্রধান উপায় হচ্ছে নির্মোহ হওয়া। মোহ হল 'অবিবেক'—প্রকৃতির জালে জড়িয়ে গিয়ে তাকে বুঝতে না পেরে তার বশীভূত হয়ে চলা। মোহ আসে প্রধানত বিষয়াসক্তি থেকে। বিষয়াসক্তিরও মূলে রয়েছে 'কাম' বা জীবনের স্বাভাবিক বহির্মুখী প্রবৃত্তি, যাতে আমরা কেবল এটা-ওটা চেয়েই চলেছি। প্রবৃত্তিতে চিত্ত বাইরের দিকে ছোটে, নিবৃত্তিতে সে গুটিয়ে আসে

ভিতরের দিকে। তখনই সে আত্মাকে দেখতে পায়। আত্মাকে দেখলেই তবে মোহ দূর হতে পারে। তখন মানুষ 'অধ্যাত্মনিত্য' কিনা কেবল আত্মাকে নিয়েই থাকে, আর কিছুই সে চায় না—কোন-কিছুতেই তার আসক্তিও নাই মোহও নাই। এমনি করে 'অমূঢ়' এবং আত্মস্থ হতে পারলে সে ব্রহ্মচক্রের ওই কেন্দ্রবিন্দুটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়—সেখানে সকল গতি স্তব্ধ। এই অব্যয়পদে প্রতিষ্ঠিত থেকে সে যখন সংসারে বিচরণ করে, তখন সে আর সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে বিচলিত হয় না (১৫।৫ ; তু. ২।৬৪)।

প্রশ্ন

পরমধামে কি সূর্য-চন্দ্রের আলোক থাকে না? সেই ধাম তো অন্ধকার নয়। তবে কাহার আলোকে আলোকিত সেই ধাম (১৫।৬)? পরম ধাম হইতে কি কখনো আর পুনরাবৃত্তি হয় না? আধিকারিক পুরুষগণ কি সেই ধামে পৌছেন না?

উত্তর

এই শ্লোকটিতে কঠোপনিষদের একটি মন্ত্রের ধ্বনি আছে।

বেদে বলা হয়েছে, 'আর্যা জ্যোতিরগ্রাঃ'—জ্যোতিই হল আর্যদের দিশারী। জ্যোতি হতে উত্তর জ্যোতি এবং তাহতে উত্তম জ্যোতিতে যাওয়ার কথাও আছে। কঠোপনিষদ এই উত্তরণের পথে পর-পর পাঁচটি জ্যোতির কথা বলেছেন—অগ্নি, বিদ্যুৎ, সূর্য, চন্দ্র ও তারকা। অগ্নি পার্থিব চেতনার জ্যোতি, বিদ্যুৎ অন্তরিক্ষের, সূর্য দ্যুলোকের। সূর্যের পর অর্থাৎ সূর্যদ্বার ভেদ করে পাওয়া যায় সোমের ষোড়শী ধ্রুবা কলা। তারও ওপারে অমানিশার অন্ধকারে নক্ষত্রের ঝিকিমিকি। জ্যোতিরনুভবের এই হল চরম। তারপর আর আলো থাকে না, দৃশ্যও থাকে না। কিন্তু উপনিষদ বলেন, তখন আত্মবোধের 'স্বয়ংজ্যোতিঃ' থাকে। সে কেবল 'অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ'—বিশুদ্ধ সন্মাত্রের বোধ। তাতে আলো বা

অন্ধকারের দ্বৈতস্পৃষ্ট সংজ্ঞা খাটে না। অথচ সেই অনালোকের আলোকেই ওই পাঁচটি জ্যোতি উদ্‌ভাসিত হয়। কারও দ্বারা অনুদ্‌ভাসিত অথচ সবার উদ্‌ভাসক ওইটি হল বেদে বিষ্ণুর পরম পদ বা পরম ধাম।

এই পরমধামের স্বরূপ সম্পর্কে বেদে মতবিকল্প আছে। শাকপূণি বলেন, ওটি দ্যুলোকে বিষ্ণুর বা মাধ্যন্দিন সূর্যের ধাম। ঔর্ণবাভ বলেন, ওটি বিষ্ণুপদকেও ছাপিয়ে গয়শীর্ষে এক অনালোক ধাম। ছান্দোগ্যোপনিষদ বলছেন, দুটিই সত্য। পরমপুরুষের সামনে শুক্লভাতি, আর পিছনে পরঃকৃষ্ণের নীলিমা।

এখানে এই নীলিমাকে লক্ষ্য করা হয়েছে। এটি অক্ষর ব্রহ্ম। আর শুক্লভাতি মহদ্‌ ব্রহ্ম। উপনিষদের ভাষায় একটি অসম্ভূতি অর্থাৎ সেখানে কোন-কিছুরই সম্ভাবনা নাই; আরেকটি সম্ভূতি—সেখান থেকে সব-কিছুই সম্ভব। আমাদের অধ্যাত্মসাধনার দিক থেকে একটি অনাবৃত্তি—সেখানে গেলে আর কেউ ফিরে আসতে পারে না; আরেকটিতে চলছে আবৃত্তি বা আসা-যাওয়ার খেলা। ওই অনাবৃত্তিই হল পরমপুরুষের পরম ধাম, অবর ধাম হল যেখানে আবর্তন চলছে।

জীবের পরম লক্ষ্য হল ওই অনাবৃত্তির পদ। কিন্তু সেখানে গেলে তো আর ব্যষ্টি জীবচেতনা থাকে না যে সে বলবে, আমি এখানে থাকব কি থাকব না। যখন আমরা ঘুমাতে যাই, তখন জেগে থাকব বলে ঘুমাই না—ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যাবার জন্যই ঘুমই। এখানেও তেমনি 'আর ফিরব না' বলেই অসীম শূন্যে ঝাঁপ দিই। তারপর তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি ওখান থেকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। ফেরত পাঠান কোন-একটা অধিকার দিয়ে। যাঁদের পাঠান, তাঁরাই আধিকারিক পুরুষ। তাঁরা পরমপুরুষের অনাবৃত্তি বা অসম্ভূতি এবং আবর্তন বা সম্ভূতি দুয়েরই খবর রাখেন। সুতরাং

যেমন পরমপুরুষের তেমনি তাঁদেরও অনাবৃত্তিপদে প্রতিষ্ঠিত থেকেই আবর্তন ঘটে (তু. পরমপুরুষের আত্মসম্ভূতি ৪·৬)।

প্রশ্ন

'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' (১৫।৭)—প্রত্যেকটি শব্দের রহস্য ব্যাখ্যা করুন। জীব ভগবানের সনাতন অংশ—ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য কি? ভগবৎসত্তার ন্যায় জীবসত্তাও কি শাশ্বত? জীবসত্ত্ব আর ব্যক্তিজীবের মধ্যে পার্থক্য কি? সত্তার বিশিষ্ট রূপই কি ব্যক্তি?

উত্তর

আগেই বলা হয়েছে, পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ। পুরুষের আবার দুটি বিভাব—ঈশ্বর এবং জীব। এতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর এবং তাঁর ক্ষেত্র বা প্রকৃতির (এখানে 'অব্যয় অশ্বত্থ' ১৫।১) কথা বলা হচ্ছিল। এখন বলা হচ্ছে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব আর তাঁর প্রকৃতির কথা।

পরমেশ্বরের সনাতন 'অংশই' জীবলোকে জীব হয়েছে। 'অংশ' সংজ্ঞাটি কিন্তু এখানে খণ্ড বোঝাচ্ছে না—বোঝাচ্ছে 'অংশু' বা কিরণ। বেদে সপ্ত আদিত্যের কথা আছে (ঋ. ২।২৭।১, ৯।১১৪।৩, ১০।৭২।৮-৯)। তাঁদের মধ্যে 'অংশ' একজন আদিত্য। আদিত্যদের মধ্যে বরুণ মিত্র অর্যমাকে (উপনিষদের ও বেদান্তের সৎ চিৎ আনন্দ) নিয়ে একটি পরার্ধ, আর ভগ অংশ এবং দক্ষকে নিয়ে একটি অপরার্ধ। 'তুবিজাত' ইন্দ্র সেতু। এই হিসাবে অংশ হলেন 'মিত্রে'র পালটি। মিত্র ব্যক্ত জ্যোতির আনন্ত্য, যেমন বরুণ অব্যক্ত জ্যোতির আনন্ত্য। সোজা কথায় মিত্র সূর্য, 'অংশ' তাঁর একটি অংশু বা কিরণ। যজুর্বেদে তাঁকে 'সুষুম্ণঃ সূর্যরশ্মিঃ' বলা হয়েছে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত শুনঃশেপের বারুণমন্ত্রে বলা হয়েছে 'নীচীন কেতু'—যার বুধ্ন উপরে এবং যা আমাদের মধ্যে নিহিত। উপনিষদে ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করে এই 'রশ্মি' বা 'কেতু' বা 'অংশে'র অনুপ্রবেশের কথা আছে।

সূর্য আর সূর্যের কিরণ দুইই নিত্য। তেমনি ঈশ্বর আর জীবও 'সনাতন' কিনা চিরকাল ধরে তাঁরা আছেন। তার মধ্যে ঈশ্বর নিত্যসত্ত্ব, আর জীব মিশ্রসত্ত্ব—কিন্তু তার স্বরূপ নিত্যসত্ত্ব। আবার মিশ্রসত্ত্বতা বা সত্ত্বে রজস্তমের মিশ্রণ, নিত্যসত্ত্ব ঈশ্বরেরই 'স্ব-বশ' ক্রিয়া। জীব 'অবশঃ প্রকৃতের্বশাৎ', কিন্তু ঈশ্বর 'বশী' (ঋ. ১০।১৯০।২ ; গী. ৯।৮), প্রকৃতির 'ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ' (১৩।২২)। তাই তিনি মিশ্রভাব দ্বারা অপরামৃষ্ট।

এর পর জীবের তিনটি অবস্থার কথা বলা হয়েছে—শরীর গ্রহণ করে বিষয়োপসেবা বা গুণান্বিত হয়ে ভোগ করা, তারই ভিতর দিয়ে তার উৎক্রান্তি বা নিজের উৎসের দিকে ক্রমে-ক্রমে উজিয়ে যাওয়া ; আর ওইখানেই তার স্বরূপত নিত্যস্থিতি (১৫।৮-১০)। এই অবস্থাগুলি যতমান যোগীর প্রত্যক্ষগোচর (১৫।১১)। এই যোগীও 'ক্ষেত্রজ্ঞ', কিন্তু ঈশ্বর 'ক্ষেত্রপতি'।

ঈশ্বর এক, জীব বহু। যেমন এক সূর্য, আর তার বহু রশ্মি। 'বহুরশ্মি'—এও কিন্তু একটা কথার কথা। একদিক দিয়ে সব রশ্মিই একরকম। প্রকাশ এবং ব্যাপ্তি সবারই সাধারণ ধর্ম, তাদের সবার সঙ্গে সবার মেশামেশি চলছে। এখানে বহুত্ব একটা উপাধি মাত্র। এইটি হল জীবসত্ত্বের উপমান।

আবার রশ্মিরা স্বরূপত অবর্ণ হলেও তাদের মধ্যে বর্ণবৈচিত্র্য দেখা দিতে পারে। বর্ণের বৈশিষ্ট্যে জীবসত্ত্বে জীবব্যক্তির ভেদ।

জীব তাঁর সনাতন 'অংশ' কিনা একটি কিরণ, অংশের এই প্রাচীন অর্থটি গ্রহণ করলে লক্ষণটি সুসমঞ্জস হয়। 'অংশ'কে খণ্ড অর্থে গ্রহণ করলে বিরোধের ভাবনাই প্রবল হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন

ওজ এবং তেজের মধ্যে প্রভেদ কি? সোম কি রসাত্মক চন্দ্র? আমাদের জীব-জগতের পুষ্টির মূল কি চন্দ্র (১৫।১৩)? চন্দ্র কি-ভাবে ক্ষয়ের

পরিপূরক? সূর্য-চন্দ্র-অগ্নির তেজ যাঁহা হইতে সমুদ্ভূত, তিনি কে? তাঁহাকে কি উপনিষদের বৃহৎ জ্যোতি বা জ্যোতিঃপুঞ্জ বলা চলে?

উত্তর

জীবের কথা বলে জীব যাঁর 'অংশ', সেই ঈশ্বরের কথা আবার বলা হচ্ছে।

ঈশ্বর সর্বগত জ্যোতিঃস্বরূপ। বেদে তাঁকে 'বৃহৎ জ্যোতিঃ' বলা হয়েছে। বৃহৎ জ্যোতিই ব্রহ্মজ্যোতি। জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ে 'রশ্মি' বা 'অংশ' হয়ে; আর তা গুটিয়ে এলে হয় 'তেজ' (তু. ঈ. ১৬)। বেদে তিনটি চিন্ময় তেজের কথা আছে—পৃথিবীতে অগ্নি, দ্যুলোকে আদিত্য, আর আদিত্যকে পার হয়েও চন্দ্রমা। আবার আদিত্যের নীচে অন্তরিক্ষস্থান চন্দ্রমার কথাও আছে। এখানে তাকে বলা হয়েছে সোম। অন্তরিক্ষ প্রাণলোক। তা সোম্য চিৎশক্তির আধার। তা-ই রস হয়ে ওষধিকে পুষ্ট করে। ওষধিরা প্রাণীদের অন্ন। অন্নের পরিপাকে প্রাণিদেহের পুষ্টি। অগ্নি বৈশ্বানর এই পরিপাকের দেবতা। বৈশ্বানর তিনিই।

দুটি জগৎ পাচ্ছি—একটি তেজোময়, আরেকটি ওজোময়। নিষ্প্রাণ-সপ্রাণ সবার অন্তর্নিহিত এবং উদ্ভাসক চিৎশক্তি হল 'তেজ'। যা বিশেষ করে সপ্রাণ সত্ত্বের অন্তর্নিহিত, তা 'ওজঃ'। বেদে তাকে 'মনস্বান্' ইন্দ্রের প্রভব বলা হয়েছে—অশ্ব তার প্রতীক। পরমপুরুষ এই ওজঃশক্তিরূপে পৃথিবীতে আবিষ্ট হয়ে সর্বভূতকে ধরে আছেন (১৫।১৩)।

তেজের জগৎ এবং ওজের জগতের চাইতেও উৎকৃষ্ট হল প্রজ্ঞানের জগৎ। প্রজ্ঞানের করণ হল হৃদয়—সেখানে শ্রদ্ধার উন্মেষ হলে মানুষের শুরু হয় আধ্যাত্মিক এষণা, তাঁকে জানবার সাধনা। হৃদয়ে-হৃদয়ে এই এষণাও তিনিই। তাঁর প্রেরণাতেই বেদ-বেদান্তের উন্মেষ —যাদের লক্ষ্য হল তাঁকে জানা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিই তাঁকে জানেন। কেননা তাঁকে জানা মানে তিনি হওয়া।

এমনি করে জড় প্রাণ ও চৈতন্যের তিনটি জগতেই তাঁর আবেশ এবং উদ্‌ভাস। তিনিই সব।

প্রশ্ন

ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তমের একটু বিশ্লেষণ করিলে ভাল হয়। লোকে এবং বেদে আমি (ভগবান্) পুরুষোত্তমরূপে প্রখ্যাত। পুরুষোত্তমরূপে জানাই সর্বভাবে ভগবানকে জানা, সর্ববিদ্‌ও এইরূপ জ্ঞানীকেই বলা হয় (১৫।১৬-১৯)। সংজ্ঞাগুলির রহস্য জানিতে ইচ্ছা হয়।

উত্তর

তিনিই সব—'পুরুষ এবে.দং সর্ব্ম্' (ঋ. ১০।৯০।২)। 'পুরুষ' বেদে একটি অখণ্ড সংবর্তুল (global) সংজ্ঞা। সাংখ্যের পুরুষ আর ঔপনিষদ পুরুষে ভাবনার একটু তফাত আছে। সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত; কিন্তু বেদের পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযুক্ত—প্রকৃতি তাঁর স্বীয়া প্রকৃতি।

সাংখ্যে প্রকৃতি নিত্যপরিণামিনী অর্থাৎ ক্ষরস্বভাবা। এই প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের কোনও যোগ নাই। এটি উজান পথের কথা—যখন 'অপরা' প্রকৃতি হতে নিজেকে তফাত করা আমার অভীষ্ট। আমি তখন দ্রষ্টা মাত্র—ভোক্তাও নই, কর্তাও নই। কিন্তু সমগ্র দৃষ্টিতে প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়াই পুরুষের প্রেষণায় এবং অনুশাসনে চলছে। তখন ক্ষরস্বভাব জগৎকে প্রকৃতি, আর অক্ষরস্থিতিকে পুরুষ বলবার কোনও সার্থকতা থাকে না। তখন 'অক্ষর' যেমন পুরুষ, 'ক্ষর'ও তেমনি পুরুষ। 'পুরুষ এবেদং সর্ব্ম্' —অক্ষর এবং ক্ষর দুইই তিনি।

ক্ষর আর অক্ষর এই দুটি সংজ্ঞা আর একবার গীতায় ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, 'অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম', আর 'অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ' (৮।৩,৪)। তখন অক্ষর আর ক্ষরকে দেখা হয়েছে তত্ত্ব-

দৃষ্টিতে—বিভজ্যবাদীর দৃষ্টি নিয়ে। উজান পথে চলবার সময় এই দৃষ্টির প্রয়োজন হয়—প্রকৃতিপরিণামের উর্ধ্বে একটা কূটস্থ অচল প্রতিষ্ঠা লাভ করবার জন্য। তখন বলি, 'নেতি নেতি'—তিনি এ নন, তিনি তা নন। কিন্তু কূটে বা গিরিশৃঙ্গে পৌঁছে দেখি, অক্ষীয়-মাণ উৎসের শতধারায় তিনি প্রবাহিত। যিনি অরূপ, তিনিই বিশ্বরূপ—সবই তিনি। তখনই বলি, পুরুষ যেমন অক্ষর, তেমনি আবার ক্ষরও।

ক্ষর আর অক্ষর দুটি স্বতোবিরুদ্ধ কথা। বুদ্ধিতে এই বিরোধের সমাধান হয় না—হয় বোধিতে। বুদ্ধির অদ্বৈত বহুকে ছেঁটে ফেলে ; আর বোধির অদ্বৈত বহুকে নিয়েই।

যে-পুরুষে ক্ষর আর অক্ষরের বিরোধের সমাধান সম্ভব, তাঁকে তাহলে আরেকটা সংজ্ঞা দিতে হয়। সে-সংজ্ঞাটি হচ্ছে 'পুরুষোত্তম'। ক্ষর-অক্ষরের প্রসঙ্গ যখন প্রথম উঠেছিল, তখন অর্জুনের বোধে এই সমাধানের একটা আভাস জেগেছিল। তাই সেখানে দেখি, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে 'পুরুষোত্তম' বলে সম্বোধন করছেন (৮।১)। গীতায় সংজ্ঞাটির এই প্রথম প্রয়োগ।

পুরুষোত্তম সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এখানে বলা হচ্ছে, যিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হতেও উত্তম, তিনি পুরুষোত্তম। তাঁর আর দুটি সংজ্ঞা হচ্ছে 'পরমাত্মা' এবং 'ঈশ্বর'। তিনি 'অব্যয়' অর্থাৎ অক্ষর ; কিন্তু লোকত্রয়ে আবিষ্ট এবং তার ভর্তা (১৫।১৭-১৮)। অর্থাৎ তিনিই সব-কিছু হয়েছেন—পুরুষ এরে.দং সর্বম্। কিন্তু হয়ে ফুরিয়ে যাননি—অক্ষররূপে সবাইকে ছাপিয়ে আছেন। আবার ছাপিয়ে আছেন বলে বিবিক্ত হয়ে নাই—সবার মধ্যে আবিষ্ট হয়ে আছেন। তাছাড়া অধিযজ্ঞ পুরুষরূপে, পরমাত্মরূপে এই দেহেই তাঁর অনুভব হয় (৮।৪, ১৩।২২, ৩১)। আর তখনই তাঁকে 'সর্ব-তারেন'.জেনে সর্ববিৎ হওরা যায়। এই জ্ঞান 'অসম্মূঢ়ে'র জ্ঞান—রূপ

আর অরূপ উভয়ের তত্ত্ব জানে বলেই যার রূপের মোহ নাই, আবার অরূপের মোহও নাই (১৫।১৯)।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'লোকে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তমরূপে প্রথিত (১৫।১৮)'। লোকে তিনি পুরুষোত্তম—অসম্মূঢ় অন্তরঙ্গের কাছে। কিন্তু বেদে 'পুরুষোত্তম' সংজ্ঞাটি পাওয়া যায় না। তার জায়গায় ছান্দোগ্যোপনিষদে 'উত্তম পুরুষ' সংজ্ঞাটির প্রয়োগ আছে (৮।১২।৩)। সেখানকার বর্ণনা কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে বেশ মিলে যায়—যদিও সংজ্ঞাটি সেখানে একটি সাধারণ সংজ্ঞা। ছান্দোগ্যোপনিষদের সঙ্গে ভাগবতধর্মের যোগ ঘনিষ্ঠ।

লক্ষণীয়, নবম অধ্যায়ের রাজগুহ্যের মত এই পুরুষোত্তম-যোগকেও 'গুহ্যতমং শাস্ত্রম্' বলা হয়েছে। 'বুদ্ধিমান' এটি বুঝে নিলে নিজের কাজ হাসিল করে নিতে পারে (১৫।২০)।

ষোড়শ অধ্যায়

প্রশ্ন

'দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ' (১৬।৬)। সৃষ্টির মূলে এই দ্বন্দ্বের স্রষ্টা কে? দৈবী সম্পদ্গুলির একটু বিশ্লেষণ করিলে ভাল হয়।

উত্তর

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রকৃতি-পুরুষের প্রসঙ্গের জের চলেছে পঞ্চদশ অধ্যায় পর্যন্ত। তার মধ্যে ক্রমে-ক্রমে পুরুষের তত্ত্বটিই বিশেষ করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যার পর্যবসান ঘটেছে পুরুষোত্তম-তত্ত্বে। এই অনুষঙ্গে প্রকৃতির কথাও আমরা মোটামুটি জানতে পেরেছি।

সৃষ্টি হচ্ছে প্রকৃতির পরিণাম। এই পরিণামের পিছনে একটা লক্ষ্য কাজ করছে. সে হল বেদের ভাষায় প্রজ্ঞানের ক্রমিক আবির্ভাব। উদ্‌ভিদ্ থেকে পশুতে, পশু থেকে মানুষে আমরা ক্রমেই প্রজ্ঞানের উৎকর্ষ ঘটতে দেখি (ঐতরেয়ারণ্যক)।

কিন্তু এই উৎকর্ষ সহজ রীতিতে হয় না। বৈদিক ঋষিরা বলেন, প্রাণ আর প্রজ্ঞা যেন একটা বিরুদ্ধশক্তির পাষাণ-কারার অন্তরালে রয়েছে। এই বিরুদ্ধশক্তির নাম দেওয়া হয়েছে 'বৃত্র' কিনা আবরিকা শক্তি। বেদে সে অসুররূপে বর্ণিত হয়েছে। বৃত্র যেমন অসুরদের রাজা, তেমনি ইন্দ্র দেবতাদের রাজা। ইন্দ্র বৃত্রঘাতী। জগৎ জুড়ে চলছে দেবাসুরের দ্বন্দ্ব। আমাদের মধ্যে সে-দ্বন্দ্ব কি আকার ধরে, গীতায় তার একটি প্রাঞ্জল বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—রূপককে বিশ্লেষণ করা হয়েছে মনোবিজ্ঞানের রীতিতে।

উপনিষদ বলেন, দেবতা আর অসুর দুইই প্রজাপতির সন্তান অর্থাৎ সৃষ্টির মূলে দেবভাব আর অসুরভাব দুইই রয়ে গেছে বরাবর, আর তারা থাকবেও। অন্ধকার ভেদ করে আলো ফুটছে—এই হল বিশ্বলীলার নিত্যপ্রত্যক্ষ সত্য। শুধু আলো বা শুধু অন্ধকার থাকলে সৃষ্টি হত না। সৃষ্টি একটা শক্তির স্ফুরণ, আর শক্তির

স্ফুরণ হতে গেলেই তার একটা প্রতিপক্ষ থাকা চাই। শেষ পর্যন্ত দেবশক্তিরই বিজয় হবে, কিন্তু হবে অসুরের সঙ্গে লড়াই করে নিজের মধ্যে শক্তির মুক্তি ঘটিয়ে।

যদি মুক্তি থাকে, তাহলে বন্ধনও আছে। কিন্তু বন্ধন থাকলেও বন্ধনচেতনা সবার থাকে না। বন্ধনচেতনা যাদের নাই, তারা বন্ধনকেই স্বাভাবিক মনে করে। বরং কেউ যদি বন্ধন ঘোচাবার চেষ্টা করে, তাহলে তারা বিরক্ত হয়। গীতায় এদের বলা হয়েছে আসুর-ভূতসর্গ (১৬।৫,৬)। এরা 'মূঢ়া জন্মনি জন্মনি' (১৫।২০)।

কিন্তু মোহের ঘোর একসময় ফিকা হয়ে আসেই। তখন জীবের বন্ধন অসহ্য মনে হয়, সে চায় মুক্তি। যাদের মধ্যে এই মুমুক্ষুত্ব জেগেছে, তারা 'দৈব ভূতসর্গ' (ঐ)।

আঁধার ধীরে-ধীরে আলো হয়ে উঠবে, এই হল প্রকৃতি-পরিণামের রীতি। অবশ্য নিরবচ্ছিন্ন আঁধার আর নিরবচ্ছিন্ন আলো—এও আছে। উপনিষদে তাদের বলা হয়েছে 'অন্তঃ' আর 'আপঃ'। কিন্তু তারা পড়ে অব্যক্তের এলাকায়। আমরা ব্যক্তমধ্য, আছি দুটি অব্যক্তের মাঝখানে (তু. ২।২৮)। আমাদের বেলায় আলো-আঁধারের লড়াইটাই সর্বজনীন সত্য ; আর অন্ধকার হতে আলোতে উত্তরণ বা বন্ধন হতে মুক্তি—এই হল আমাদের পরমপুরুষার্থ।

বাঁধা হয় গুণ দিয়ে। প্রকৃতির তিনটি গুণ পুরুষকে বাঁধে। চতুর্দশ অধ্যায়ে তার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তিনটি গুণই বন্ধনের কারণ হলেও বিশেষ করে আমাদের বাঁধে তমোগুণের মূঢ়তা আর রজো-গুণের চাঞ্চল্য। সত্ত্বগুণের ধর্ম হচ্ছে প্রকাশ আর সুখ। তার অনুশীলন আমাদের নিয়ে যায় মোক্ষের দিকে। মোটামুটি বলা যেতে পারে আসুর ভূতসর্গ তমঃ আর রজোগুণের কবলিত, আর দৈব ভূতসর্গ সত্ত্বগুণপ্রধান। আসুর ভূতসর্গেও সত্ত্বগুণের কিছুটা আলো পড়ে, তাইতে তারা যাগযজ্ঞাদিও করে—তবে কিনা করে অবিধিপূর্বক আর দম্ভভরে (১৬।১৭)।

আসুর ভূতসর্গে দুটি অবগুণ প্রবল—একটি অহঙ্কার, আরেকটি কাম। গীতায় আসুরভাবাপন্নের যে-বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে এই দুটির চেহারাই খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এদেরই অন্যত্র বলা হয়েছে ভোগ এবং ঐশ্বর্য (তু. ২।৪২,৪৩), যা বেদবাদীদের মধ্যেও থাকে। ভোগ আর ঐশ্বর্যের দিব্যরূপ আমরা দেখি প্রকৃতির 'ভোক্তা মহেশ্বর' পরমাত্মায় বা পুরুষোত্তমে (তু. ১৩।২২, ১৫।১৭)। কিন্তু আসুর ভূতসর্গ সম্পূর্ণ ক্ষরভাবের কবলিত—অক্ষরে উত্তীর্ণও নয়, তাহতে উত্তম হওয়া তো দূরের কথা। আসুরভাবাপন্ন জীব ঈশ্বর নয়, অথচ নিজেকে সে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করে (১৬।১৪)—এই তার মহামোহ। এদিকে যখন সে তত্ত্ববিৎ সাজে, তখন সে জগৎকে বলে 'অনীশ্বর'। তার মতে ঈশ্বর জগতের 'হেতু' বা প্রয়োজক নন। ঈশ্বরের সত্যে জগৎ সত্য বা তাঁর প্রতিষ্ঠায় এর প্রতিষ্ঠা—উপনিষদের ঋষির এই দর্শনকে সে স্বীকার করে না। সে বলে, জগদ্ব্যাপারে আমরা দেখতে পাই একটা 'অপরস্পর' বা ক্রিয়াসাতত্যের খেলা (দ্র. পাণিনি ৬।১।১৪৪)—একটার পর একটা ক্রিয়ার মিছিল, যার মূলে এক পৌনঃপুনিক অন্ধ বাসনা বা 'কাম' [তু. বৌদ্ধ তণ্হা] ছাড়া আর-কিছুর প্রেরণা নাই। এই দর্শন যদি সত্য হয়, তাহলে নিরবচ্ছিন্ন কামসম্ভোগ দ্বারা অহংএর পরিতর্পণ ছাড়া জীবনের আর-কোনও লক্ষ্য থাকতে পারে না।

এই ভাবনার ফলে যে-সিদ্ধি, তাও 'সম্পদ্' বা অভ্যুদয়ের কারণ হতে পারে। গীতায় তাকে বলা হয়েছে 'আসুরী সম্পদ'। আসুর-জনের একটি ফলাও বর্ণনা পাই এই অধ্যায়ের ৭ হতে ১৮ শ্লোক পর্যন্ত। শ্রীকৃষ্ণের যুগে আসুরজনের প্রতিভূ ছিল দুর্যোধন আর দুঃশাসন। দুর্যোধনের প্রচণ্ড আত্মাভিমান আর দুঃশাসনের দ্বারা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ যথাক্রমে 'দম্ভ-মান-মদ' এবং 'দুষ্পূর কামে'র উদাহরণ (তু. ১৬।১০) বর্তমানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উপর আসুর

ভাবের করাল ছায়া পড়েছে, আর এদেশের উপরও তার সংক্রমণ দুর্লক্ষ্য নয়।

আসুরী সম্পদের বিপরীত হল দৈবী সম্পদ। সে-সম্পদ বাইরের নয়, অন্তরের। তার ফল একটা আধ্যাত্মিক আভিজাত্য (১৬।৩)—যা মানুষকে কিছুতেই প্রবৃত্তির পথে গড়িয়ে যেতে দেয় না, যা তার মধ্যে ফুটিয়ে তোলে সত্য শৌচ এবং সদাচার (১৬।৭)।

এই সম্পদ যার লাভ হয়, তার মধ্যে যেসব গুণের স্ফুরণ হয়, শ্রীকৃষ্ণ তার একটা দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। সিদ্ধের মধ্যে গুণগুলি স্বতঃস্ফূর্ত, সাধকের বেলায় সাধ্য। সাধনার দিক দিয়ে গুণগুলিকে প্রত্যেকের রুচি ও সংস্কার অনুসারে নানাভাবে সাজিয়ে নেওয়া যায়। একটা ছক এই হতে পারে:

দৈবী সম্পদে যে অভিজাত হতে চায়, সত্যপ্রতিষ্ঠা তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য (২, তু. ৭)। সত্যকথনরূপ বাঙ্‌ময় তপঃ (১৭।১৫) তার অন্যতম সাধন। ঈশ্বরই জগতের প্রতিষ্ঠা, তিনিই পরম সত্য (তু. ১৬।৮)। তাঁকে লাভ করাই যথার্থ সত্যপ্রতিষ্ঠা (তু. ১৪।২৭)। তার জন্য প্রথমেই দরকার প্রবৃত্তির রাস টেনে ধরে মনকে নিবৃত্তিমুখী করা (তু. ৭, আসুরজনের মধ্যে এইটির অভাব)। সংযম তার প্রধান সাধন। বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম হল **দম**, আর অন্তরিন্দ্রিয়সংযম **শম**, যার পরিণাম চিত্তের অনাবিল শান্তি (১, ২)। অভ্যাসে শম-দম স্বভাবগত হয়ে যায়। যে-শক্তিতে তা হয়, তার নাম **ধৃতি** (৩)। এখানে সাত্ত্বিকী ধৃতিই লক্ষ্য, যার কথা পরে বলা হয়েছে (১৮।৩৩)। ধৃতির আরেক নাম ধারণা; ধারণা হল সাধনার ফলকে ধরে রাখবার সামর্থ্য। ধৃতিতে সঞ্চিত শক্তির যে-বিকিরণ, তাকে বলে **তপঃ** (৪)। তপের কথাও পরে বিস্তৃত করে বলা হয়েছে (১৭।১৪-১৯)। না বুঝে শরীরকে এবং সেইসঙ্গে অন্তঃশরীরস্থ দেবতাকে নানারকম পীড়নের দ্বারা কষ্ট দেওয়াকে গীতায় বলা হয়েছে 'আসুর তপ' (১৭।৬)। তপস্যার পরম ফল

হল মনঃপ্রসাদ সৌম্যত্ব এবং ভাবসংশুদ্ধি (১৭।১৬)। বেদে তপস্বীর আদর্শ অগ্নি এবং সূর্য—জ্যোতিঃশক্তির স্বচ্ছন্দ বিকিরণ যাদের স্বভাব।

এমনি করে শম দম ধৃতি এবং তপের ফলে আধার সত্যোপলব্ধির যোগ্যতা লাভ করে। সত্যের সাধনায় আমাদের যাঁরা অগ্রগামী, তাঁরা তাঁদের উপলব্ধিকে বাণীর রূপ দিয়ে গিয়েছেন। এই বাণীর নাম 'বেদ'। 'শাক্ত' বা শক্তিসঞ্চারসমর্থ যে-কোনও আচার্য-বাণী বেদ, একথা বেদেই আছে। বেদের বাণীকে বলে 'মন্ত্র'। মন্ত্র বিস্তৃত বা বীজাকারে সংক্ষিপ্ত দুইই হতে পারে। তার অনুশীলন বা জপকে বলে **স্বাধ্যায়** (১)। স্বাধ্যায়ে ইষ্টদেবতার সঙ্গে মিলন হয় (তু. যোগসূত্র ২।৪৪)। মিলন একদিনে হয় না। প্রথম জাগে শ্রদ্ধা, তারপর রতি বা তাঁর প্রতি প্রাণের টান। তখন আমার সব-কিছু তাঁকে ঢেলে দিতে ইচ্ছা হয়। এমনি করে আমার যা-কিছু সব তাঁর করে দেওয়াকে বলে যজ্ঞ'(১)। যজ্ঞ আবার দু-রকম—দ্রব্যযজ্ঞ আর জ্ঞানযজ্ঞ। দ্রব্যযজ্ঞ বাহ্যোপকরণের এবং নানা অনুষ্ঠানের অপেক্ষা রাখে। তার কথা পরে বলা হবে (১৭।১১-১৩)। জ্ঞানযজ্ঞ হল অন্তর্যাগ—যোগীদের দৈবযজ্ঞ। তার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে (৪।২৪-৩৩)। সব যজ্ঞেরই মূল সূত্র হল 'ইদং তব, ন মম'—এ তোমার, আমার নয় বলে সব-কিছু তাঁতে অর্পণ করা (তু. ৯।২৭, সেখানে কর্ম ভোগ হোম দান তপস্যা সবই তাঁতে অর্পণ করার কথা বলা হয়েছে)। এমনি করে সমস্ত জীবনটাকেই যজ্ঞে রূপান্তরিত করাকে উপনিষদে বলা হয় 'পুরুষ-যজ্ঞ'—যার অনুশাসন শ্রীকৃষ্ণ পেয়েছিলেন ঘোর আঙ্গিরসের কাছ থেকে।

দ্রব্যযজ্ঞের আহুতি দিতে হয় অগ্নিতে, আর জ্ঞানযজ্ঞের বা জীবন-যজ্ঞের আহুতি ব্রহ্মাগ্নিতে (৪।২৪)। বেদ বলেন, সব আহুতিই প্রকৃতপক্ষে আত্মাহুতি। আমার ভাল-মন্দ সব-কিছু তাঁর

আগুনে ঢেলে দিলাম। তার ফলে আমার সব মালিন্য পুড়ে গেল, আমি শুচি হলাম। এই শৌচ (৩) একটি দৈবী সম্পদ।

মনের মালিন্যের মধ্যে তিনটি প্রধান—কাম, ক্রোধ, আর লোভ। একটু পরেই ভগবান্ বলছেন, এই তিনটি হল নরকের দ্বার, এরা আত্মাকে নষ্ট করে (১৬।২১)। আরেকটি মালিন্যের কথা কর্মযোগপ্রসঙ্গে আগে বলেছেন—অহঙ্কার (৩।২৭)। আবার এদের মধ্যেও মানুষের সবচাইতে বড় শত্রু হল কাম—যা তার সমস্ত পাপাচরণের মূলে, যা তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়। কামের অধিকার শুধু ইন্দ্রিয় নয়—মন এবং বুদ্ধি পর্যন্ত ব্যাপ্ত। তাইতে বুদ্ধিরও ওপারে যে-পরমতত্ত্ব, কাম মানুষকে তা দেখতে দেয় না। এই বলে ভগবান্ যোগীকে কাম-সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন (দ্র. ৩।৩৬-৪৩)। কামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে ক্রোধ—কেননা কাম বাধা পেলেই ক্রোধ হয়ে ফুটে ওঠে (২।৬২)।

কাম আর তার জুড়ি ক্রোধই হল মানুষের মনশ্চাঞ্চল্যের কারণ, আর যোগের পথে তারা সবচাইতে বড় বাধা (দ্র. ৩।৩৬-৩৭)। আর তৃতীয় মালিন্য লোভ কামেরই রকমফের। কাম সূক্ষ্ম আসুরী বৃত্তি, লোভ স্থূল রাক্ষসী বৃত্তি। কাম আর ক্রোধের মত লোভও রজোগুণের পরিণাম (তু. ৩।৩৭ এবং ১৪।১২, ১৭)। চতুর্থ মালিন্য অহঙ্কার রাজসী বৃত্তি হলেও তার মূলে রয়েছে মোহ—যা অন্ধতমিস্রা বা অবিদ্যা হয়ে আত্মার স্বরূপকে ঢেকে রাখে। অহঙ্কারের রাজসিক দিকটা যে কী উৎকট হতে পারে, ভগবান্ এ-অধ্যায়েই তার বর্ণনা দিয়েছেন (৯-১৮)।

যজ্ঞভাবনার ফলে অন্তরে-বাইরে যখন শৌচ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই মালিন্যগুলি দূর হয়ে তাদের বিপরীত দৈবী সম্পদ্‌গুলি মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠে।

লোভ গেলে দেখা দেয় **অলোলুপতা** (২), যার প্রধান লক্ষণ যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টি (৪।২২ ; তু. ১২।১৪, সন্তুষ্টো য়েন কেন চিৎ ১৯) —যা পাওয়া গেল তাতেই খুশী থাকা, খাই-খাই চাই-চাই না করা। যে 'সতত সন্তুষ্ট' (১২।১৪), তার সুখ আর কাম্যবস্তুলাভের উপর নির্ভর করে না, তা আপনাথেকে ভিতরে উথলে ওঠে। যোগীরা একে বলেন, 'অনুত্তম সুখ' (যোগসূত্র ২।৪২)। চাইবার যখন কিছু নাই, তখন কামনার অভিঘাতের প্রশ্নও ওঠে না, সুতরাং চিত্তও **অক্রোধ** (২) হয়ে যায়। আবার কারও কাছ থেকে আঘাত পেলেও ক্রোধ জাগে। এই ক্রোধের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে হিংসা এবং দ্রোহবুদ্ধি—যা মানুষকে পরের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত করে। অক্রোধ যখন স্বভাবগত হয়, তখন তা ফুটে ওঠে **ক্ষমার** (৩) আকারে। আর ক্ষমা থেকেই আসে **অহিংসা** (২) এবং **অদ্রোহ** (৩)। কিন্তু ক্ষমার অর্থ অন্যায়কেও সহ্য করে যাওয়া নয়। তাই ক্ষমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকা চাই **তেজ** (৩) বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার বীর্য। তেজস্বী পুরুষের ক্ষমাই সত্যকার ক্ষমা—তা কাপুরুষতা নয় ; আর এমনিতর ক্ষমাবান্ পুরুষের তেজই তাকে 'বিগতজ্বর' হয়ে যুদ্ধ করতে (তু. ৩।৩০) শেখায়—যা শ্রীকৃষ্ণের এক মহৎ অনুশাসন।

অহঙ্কার স্থূলভাবে প্রকাশ পায় **দম্ভে** (১০, ১৭), বল বা জবরদস্তিতে এবং **দর্পে** (১৮) অথবা আত্মসম্ভাবনা বা হামবড়া ভাবে (১৭)। এসবই আসুরী বৃত্তি। এর মধ্যে শেষেরটিকে গীতায় বলা হয়েছে 'অতিমানিতা'—যার প্রকাশ 'আমি ঈশ্বর, আমি সিদ্ধ, আমি ধনী, আমি কুলীন, আমার মত আর কে আছে' ইত্যাকার উদ্ধত উক্তিতে (১৪–১৫)। কিছুটা মান বা আত্ম-সচেতনতাপ্রসূত আত্মসম্মানবোধ থাকা ভাল, নিজেকে একেবারে ক্লীবের পর্যায়ে নামিয়ে আনাটা কোনও কাজের কথা নয়। কিন্তু তা বলে অতিমানিতা ভাল নয়। অহঙ্কারের এই দৈব রূপান্তরকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন **'নাতিমানিতা'** (৩)।

সবচাইতে বড় মালিন্য কামের কথা আসুর ভাবের পরিচয় দেবার সময় নানাভাবেই বলা হয়েছে (দ্র. ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬, ১৮)। কামের প্রকাশ ভোগাকাঙ্ক্ষায়। ভোগের বিপরীত বৃত্তি হল ত্যাগ (২) এবং দান (১)। এই দুটির সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে (১৮।২-১০, ১৭।২০-২২)। সাধারণভাবে বলতে গেলে এ-দুটিতে পরার্থপরতার অভিব্যক্তি। সর্বভূতে দয়াকেও (২) এদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়।

অধ্যাত্মসাধনার একটি প্রধান উপজীব্য হল ব্যবহারশুদ্ধি। ভিতরে যা পেলাম, বাইরে যদি তার সুষম এবং ছন্দোময় প্রকাশ হয়, তাহলেই বুঝব আমরা যথার্থ আভিজাত্যের পথে চলেছি। যেসব দৈবী সম্পদ এই ব্যবহারশুদ্ধির পরিচায়ক, তারা হল **অচাপল** (২) বা কথায় কি আচরণে কোনরকম চপলতা প্রকাশ না করা (তাবলে অহঙ্কারে 'স্তব্ধ' [১৭] হয়ে থাকাটা অচাপল নয়); **মার্দব** (২) বা স্নিগ্ধ এবং নম্র ব্যবহার; **হ্রী** (২) বা নিজেকে জাহির করবার চেষ্টা না করা, আর সবার শেষে **অপৈশুন** কিনা কেবল পরের খুঁত ধরার অভ্যাসটি ছাড়া। এমনি করে ব্যবহার-শুদ্ধির চরম ফল হল **আর্জব** (১) কিনা জীবনের সমস্ত কুটিলতা দূর হওয়ার ফলে একটি সহজ সরল ছন্দের প্রকাশ।

দৈবী সম্পদ সাত্ত্বিক, আর আসুরী সম্পদ রাজসিক। সত্ত্বগুণ আবার দুরকমের মিশ্র- বা মলিন-সত্ত্ব যার মধ্যে রজোগুণ আর তমোগুণের ভেজাল থাকে, আর শুদ্ধসত্ত্ব যাকে গীতায় নিত্য-সত্ত্বও বলা হয়েছে (২।৪৫)। তমোগুণের একটি মৌল বৃত্তি হল ভয়—যার চরম আবার 'মৃত্যুভয়'। সব ভয়েরই মূল লক্ষণ হচ্ছে—মূঢ়ের মত যা আঁকড়ে আছি, কিছুতেই তাকে ছাড়তে না চাওয়া আর তাইতে হারাই-হারাই একটা ভাব।

দৈবী সম্পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে যেমন রাজসিক আসুরী সম্পদ বর্জন করতে হবে, তেমনি এই তামসিক ভয়কে বর্জন করে

অর্জন করতে হবে অভয়। আর এইটিই সবচাইতে কঠিন—কেননা ভয়ের শিকড় একেবারে প্রবৃত্তির মর্মমূলে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অসুরের প্রাণে ভয় নাই। কিন্তু তারও মধ্যে দুরাগ্রহ আছে, যা 'অপরিমেয় চিন্তা'র (১১) অতএব ভয়েরও হেতু।

অভয়প্রতিষ্ঠার ফল হল **সত্ত্বসংশুদ্ধি** (১) কিনা সত্ত্বগুণ হতে রজোগুণ আর তমোগুণের সমস্ত মালিন্য দূর হয়ে যাওয়া। এইটি হলেই তবে **জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি** (১) অর্থাৎ গোড়াতেই শ্রীকৃষ্ণ যে সাংখ্যবুদ্ধি আর যোগবুদ্ধির কথা বলেছিলেন (দ্র. ২।৩৯), দৈবী সম্পদে অভিজাত পুরুষে তার সম্যক্ প্রতিষ্ঠা।

প্রশ্ন

'ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু' (১৬।১৯-২০)। অসুরযোনিতে নিক্ষেপকর্তা কে? ঈশ্বরের নিক্ষেপশক্তিকে কি জীব বাধা দিতে পারে? ঈশ্বরের এইরকম ব্যবস্থা কেন?

উত্তর

আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ অবশ্য ঈশ্বরই করেন। তিনি যেমন ভক্তের 'সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ' (১২।৭), সাধুদের পরিত্রাতা (৪।৮), তেমনি আবার দুষ্কৃতদের বিনাশকর্তাও (ঐ)।

তবে তিনি এসব ব্যাপারে পক্ষপাতহীন। প্রথমত তিনি কর্তা হয়েও অকর্তা—সর্বত্র (তু. ৪।১৩-১৪ ; ৫।১৪-১৫)। এই-যে দৈবসর্গ আর আসুরসর্গ—এ হল প্রকৃতির কর্ম, মোক্ষ আর বন্ধনের অভিমুখে তার স্বাভাবিক অভিযান (১৬।৪-৫)। দুনিয়া জুড়েই এ-ব্যাপার চলছে—তিনি তার উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্তা এবং মহেশ্বর এই মাত্র। আবার প্রকৃতি যখন তাঁরই প্রকৃতি, তখন তার কর্তৃত্বও তাঁরই। কিন্তু তবুও তিনি অকর্তা।

আসুরী যোনির পথটা কলমবাড়া (sloping) পথের মত গড়িয়ে চলছে। সে-পথে একবার নামলে পর মানুষের আর হুঁশ

থাকে না, আপনাথেকেই সে নীচের দিকে গড়িয়ে চলে জন্ম-জন্মান্তর ধরে (১৬।২০)—কাম ক্রোধ লোভ এই তিনটি নরকের দুয়ার দিয়ে (১৬।২১)। এতে তার আত্মনাশ হয়, কিন্তু তা সে বোঝে না—বরং জাহান্নমের পথটাই তার ভাল লাগে।

জীব যখন নরকের পথে গড়িয়ে চলে, তখনও কিন্তু তিনি তার অন্তরে বসে বলে চলেন, ও-পথে যেও না। বলেন সাধুমুখে, শাস্ত্রমুখে। কিন্তু সে আপন বেগে গড়িয়ে চলে—যতক্ষণ না একটা ধাক্কা খায়। যেমন গড়িয়ে চলাটা একদিক দিয়ে তাঁর ব্যবস্থা, তেমনি ওই ধাক্কা খাওয়াটাও তাঁরই ব্যবস্থা। ধাক্কা খেয়ে সে চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দৈবসর্গ বা উৎক্রান্তির পথ ধরে।

এই নামা-ওঠাটাই হল ভূতসর্গের ধারা। এ আছে। কেন আছে, এ-প্রশ্ন নিরর্থক। দেবাসুরের দ্বন্দ্ব ছাড়া উৎক্রান্তি হয় না, শক্তির স্ফুরণ ঘটে না, সৃষ্টিও চলে না। শুধু আলো থাকলে বা শুধু কালো থাকলে ছবি হয় না—তার জন্য চাই ওই আলো আর কালোর মধ্যে বর্ণবিভঙ্গ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিচিত্র বর্ণের ভিতর দিয়ে আলোরই জয় হয়—যেমন দেখি ভোরবেলায়।

এই শেষ পরিণামটুকু লক্ষ্য করলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আর কোনও নালিশ থাকে না যে, কেন তিনি আলো আর কালোর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করলেন। রামকৃষ্ণদেব বলতেন জটিলা-কুটিলা না থাকলে লীলা-পোষ্টাই হয় না। মাঝখানটায় যত বাধাই থাকুক না কেন, লীলার শেষটা কিন্তু চিরমধুর। তখন সব সংশয়, সব ক্ষোভ, সব বেদনার অবসান।

প্রশ্ন

কাম ক্রোধ এবং লোভকে নরকের দ্বার কেন বলা হইল? ঈশ্বরসৃষ্ট ত্রিবিধ তমোদ্বার হইতে বিমুক্তির উপায় বা পন্থা কি? শাস্ত্রবিধি কাহাকে বলে? শাস্ত্রবিধান জানিয়া কর্ম করা সাধারণ লোকের পক্ষে কি সম্ভব? (১৬।২২-২৪)।

উত্তর

দুটি ভূতসর্গের একটি উঠে গেছে উপরের দিকে—আলোর দিকে, মুক্তির দিকে। এটি দৈবসর্গ। আর আসুরসর্গ নেমে গেছে নীচের দিকে—নরকের অন্ধকারে, বন্ধনের দিকে (১৬।৫, ২০)! আসুরী সম্পদের মূলে আছে কাম ক্রোধ এবং লোভ—বিশেষ করে কাম। এ-তিনটির কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। এদের কবল থেকে বিমুক্তির উপায় দৈবী সম্পদের অনুশীলন। তার কথাও বিস্তারিত বলা হয়েছে। গীতার নানাজায়গায় কাম-ক্রোধ বর্জনের কথা আছে (২।৫৫, ৫৬, ৭১, ৩।৩৪, ৩৭-৪৩, ৫।২৩, ২৬, ২৮, ৬।২৪, ১৮।৫৩...)। কর্মে ফলত্যাগ, জ্ঞানের সাধনায় বুদ্ধিযোগের আশ্রয় নেওয়া, আর ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি—এই তিনটিতে কাম দূর হয়। কাম গেলে ক্রোধ আর লোভও যায়।

সব শাস্ত্রের মূলে রয়েছে সিদ্ধের অনুভব এবং তজ্জন্য অনুশাসন। ওটি দৈবসর্গের পথ। বিপরীত পথটি হচ্ছে আসুরসর্গের। অসুর আলোর শাসন মানে না, কামের ধোঁয়াটাই তার ভাল লাগে। তার সিদ্ধি বা পরা গতি তো হয়ই না, সুখও হয় না (১৬।২৩)।

শাস্ত্র শুধু পুঁথির পাতায় লেখা থাকে না—থাকে তত্ত্বদর্শীদের বাণীতে এবং আচরণে। কোনকালেই এঁদের অভাব হয় না। ইচ্ছা থাকলে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন এবং সেবার দ্বারা তাঁদের কাছ থেকে শাস্ত্রের অনুশাসন সবাই জেনে নিতে পারে (তু. ৪।৩৪)।

তারও সুযোগ যদি কারও না থাকে, তাহলে সে যদি সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা নিয়ে কাজ করে, তাতেও সে দৈবী সম্পদে অভিজাত হতে পারে। এই শ্রদ্ধার কথা পরের অধ্যায়ে সবিস্তারে বলা হয়েছে।

শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ের অনুশাসনই হল আসল শাস্ত্র। তা যেমন তত্ত্বদর্শীর কাছ থেকে পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় 'আপন মনের গহন মাঝে কান পেতে'ও।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রশ্ন

'ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা' (১৭।২)। ত্রিবিধা শ্রদ্ধার একটু বিশ্লেষণ করিবেন কি? গীতার সপ্তদশ অধ্যায়কে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ-যোগ কেন বলা হইল? শারীর তপ, বাঙ্ময় তপ এবং মানস তপেরই বা তাৎপর্য কি? তপস্যাত্রয়ের রহস্য ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়।

উত্তর

আবার গোড়ায় ফিরে যাই। গীতার তৃতীয় ষট্ক শুরু হয়েছিল জগৎ এবং জীবনের রহস্যাখ্যান দিয়ে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছিল, জগতের যা-কিছু তা ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অথবা প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগ থেকে সঞ্জাত। প্রকৃতি ত্রিগুণা, আর পুরুষ গুণাধীশ এবং গুণাতীত। চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণের দিক থেকে উভয়ের পরিচয় দেওরা হল। পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তমের প্রসঙ্গে পেলাম পুরুষের সমগ্র এবং সর্বোত্তম পরিচয়। ষোড়শ অধ্যায়ে পাচ্ছি প্রকৃতির দৈব এবং আসুর এই দুটি ভূতসর্গের কথা, যাতে পরস্পরের বিপরীত দুটি জীবনাদর্শের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। দৈব জীবনাদর্শের মূলে যেমন আছে আত্মশাসনের প্রচোদনা, আসুর জীবনাদর্শের মূলে তেমনি আছে কামাচারের প্ররোচনা। যুগ-যুগ ধরে আত্মশাসনের রীতি ও ফল নিয়ে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, শাস্ত্র তারই সংগ্রহ। আত্মশাসনে যাদের রুচি নাই, যারা কামাচারী, স্বভাবতই তারা শাস্ত্র মানে না। মানুষের কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয়, তা তাকে বলে দেয় শাস্ত্র, বলে দেয় তার আদর্শ-বোধ (তু. ১৬।২৪)। তার অনুশাসন না মেনে যে আপন খুশিতে চলে, কার্যে আর অকার্যে সে গোল পাকিয়ে বসে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন,

তার কর্ম যেমন সিদ্ধিতে উত্তীর্ণ হয়না, তেমনি তার সুখ বা পরা গতিও লাভ হয় না (১৬।২৩)।

অর্জুন এখানে প্রশ্ন তুললেন, যে কামের প্ররোচনায় কাজ করে, সে শাস্ত্র মানে না। তুমি তাকে নিজের শ্রেয়ের প্রতি অন্ধ অতএব তামসিক বলতে পার (তু. ১৬।২২)। কিন্তু এমন যদি হয়, একজন জানে না বলেই শাস্ত্র মেনে চলে না ; কিন্তু তার ভিতর শ্রদ্ধা আছে, যজ্ঞভাবনা আছে। তাকে তুমি কি বলবে—সাত্ত্বিক, রাজসিক, না তামসিক (১৭।১) ?

প্রশ্নটির ব্যঞ্জনা গভীর। এর জবাব কি হতে পারে, তার আভাস ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণ দুজায়গায় দিয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গোঁড়া বেদবাদীদের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলছেন, 'ওরা অজ্ঞান, কামাত্মা, ভোগৈশ্বর্যে প্রসক্ত, ওদের বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা নয় (২।৪১-৪৪)।' যারা বেদবাদরত, তারা নিশ্চয় শাস্ত্রবিধি মেনে চলে। অথচ কামাত্মা বলে তারা নিন্দনীয়। কাজেই শাস্ত্র-বিধি মেনে চলাটাই কারও অধ্যাত্মপ্রকর্ষের মাপকাঠি নয়।

আবার নবম অধ্যায়ে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'সুদুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভাক্ হয়ে আমার ভজনা করে, তাকে সাধু বলেই মনে করবে, কেননা তার ব্যবসায় সম্যক্' (৯।৩০)। সুদুরাচার নিশ্চয় শাস্ত্রবিধি মেনে চলে না, কিন্তু তার যদি অনন্যা ভক্তি থাকে, তাহলে সে প্রশংসনীয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কারও অধ্যাত্মপ্রকর্ষের বিচার করতে হবে—বাহির দেখে নয়, অন্তর দেখে। কামাত্মারা শাস্ত্রবিধি মানতে চায় না, একথা সত্য। কিন্তু যার অন্তরে শ্রদ্ধা আছে, শাস্ত্রবিধি মানে না বলেই তাকে নিন্দনীয় বলা চলে না। ওই শ্রদ্ধার জোরেই সে দেখতে-দেখতে ধর্মাত্মা হয়ে ওঠে (৯।৩১)। আর স্বভাবতই তখন তার আচার শাস্ত্রবিধির অনুগত হয়। কাম অধর্মের, আর শ্রদ্ধা ধর্মের প্রয়োজক—এই হল আসল কথা। এই শ্রদ্ধা সবার

মধ্যেই আছে। যার ভিতরটা যেমন, তেমনি তার শ্রদ্ধা হয় সাত্ত্বিকী, না হয় তো রাজসী বা তামসী (১৭।২,৩)।

এই শ্রদ্ধা কি? ঋক্‌সংহিতার শ্রদ্ধাসূক্তে বলা হয়েছে, শ্রদ্ধা হল হৃদয়ের আকূতি কিনা গভীরভাবে তার দেবতাকে চাওয়া। অনুক্রমণিকাকার বলছেন, শ্রদ্ধা 'কামায়নী' কিনা কামের মেয়ে। কামনা আবার দুরকম—মর্ত্যের 'পুরুকাম' কিনা কেবল চাই-চাই ভাব, আর অমৃতসন্ধানীর 'দেবকামতা' কিনা কেবল দেবতাকে চাওয়া। শ্রদ্ধা এই শেষোক্ত কামের মেয়ে।

প্রশ্নোপনিষদে বলা হয়েছে, এই শরীরে যে ষোড়শকল পুরুষ রয়েছেন, তাঁর প্রথম কলাই হল শ্রদ্ধা অর্থাৎ শ্রদ্ধা দিয়েই আমাদের জীবনের শুরু (৬।২, ৪)। কঠোপনিষদে দেখি, নচিকেতার বোধোদয়ের প্রাক্‌ক্ষণে তার কিশোর-চিত্তে শ্রদ্ধা আবিষ্ট হল দেবতার প্রসাদরূপে (১।১।২)। ছান্দোগ্যোপনিষদে পাই অরণ্যে শ্রদ্ধা এবং তপঃ অবলম্বনে উপাসনার কথা—যাতে সূচিত হচ্ছে আর্য-সাধনার যথাক্রমে ঋষিধারা এবং মুনিধারা। দুয়ের সমন্বয়ের উদ্দেশ গীতাতে পাওয়া যায়। যোগসূত্রে শ্রদ্ধা উপায়-প্রত্যয়ের আদি, যার পর্যবসান হয় প্রজ্ঞায় (১।২০)।

মোটের উপর শ্রদ্ধাকে বলা যায় প্রবুদ্ধ চিত্তে প্রাতিভসংবিৎ-এর অরুণিমা—সূর্যোদয়ের আগে উষার আলোর মত। শঙ্কর তাকে বলেছেন 'আস্তিক্যবুদ্ধি' কিনা লোকোত্তর তত্ত্ব আছে—এই নিশ্চিত প্রত্যয়।

বুদ্ধি যেমন জ্ঞানের সাধন, তেমনি শ্রদ্ধা ভক্তির সাধন (তু. ১২।২০)। তবে মনে রাখতে হবে, গীতার ভাবনায় জ্ঞান আর ভক্তি ওতপ্রোত। শ্রদ্ধাবান জ্ঞান লাভ করে, অজ্ঞ অশ্রদ্দধান এবং সংশয়াত্মা বিনষ্ট হয়—এও গীতারই কথা (৪।৩৯-৪০)।

গোড়াতেই বলা হয়েছে পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ হতে জগৎ। যেমন পুরুষের বিশিষ্ট ধর্ম বুদ্ধি এবং জ্ঞান, তেমনি প্রকৃতির বিশিষ্ট ধর্ম শ্রদ্ধা

এবং ভক্তি। সৃষ্টিতে দুটিই চিৎপ্রকর্ষের প্রযোজকরূপে অনুস্যূত। ত্রয়োদশ অধ্যায় হতে শুরু করে এতক্ষণ পর্যন্ত জগদ্‌ব্যাপারে জ্ঞানের দিকটাই বড় করে দেখানো হয়েছে। এইবার সপ্তদশ অধ্যায়ে তার পরিপূরকরূপে দেখানো হচ্ছে শ্রদ্ধার দিকটা।

শ্রদ্ধা পরা প্রকৃতির স্বধর্ম হলেও জীবে তার প্রকাশ হয় গুণময়ী অপরা প্রকৃতির ভিতর দিয়ে। তাইতে সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী এই তিনরকম শ্রদ্ধার কথা ওঠে। পুরুষ শ্রদ্ধাময় (১৭।৩)—শ্রদ্ধার ভেদে সেও সাত্ত্বিক রাজসিক বা তামসিক হয়।

যেমন শ্রদ্ধা, তেমনি মানুষের রুচি। রুচির বিশিষ্ট প্রকাশ আহারে। আহার শুদ্ধ হলে সত্ত্বশুদ্ধি হবে, সত্ত্ব শুদ্ধ হলে সমস্ত বন্ধন হতে মানুষ মুক্ত হবে অর্থাৎ আসুরী সম্পদ হতে সে অভিজাত হবে দৈবী সম্পদে (১৬।৫)—একথা উপনিষদে আছে। তাই শ্রদ্ধাত্রয়ের কথা বলতে গিয়ে গোড়াতেই আহারের কথা এসে গেছে (১৭।৮-১০)। এদেশের সাধনায় আহারের উপর একটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়—তা নিরর্থক নয়। উপনিষদ বলেন, মানুষের মন অন্নময়—যেমন আহার তেমনি মন। রাজস আর তামস আহারে মনও আসুর- এবং রাজস-ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। সাত্ত্বিকী রাজসী আর তামসী শ্রদ্ধার লোকেদের কার কিরকম আহার প্রিয়, তার বর্ণনা এই অধ্যায়েই আছে (১৭।৮-১০)। আহার সম্পর্কে গীতার আরেকটি মূল্যবান অনুশাসন হচ্ছে, বেশী খাওয়া বা একেবারে না খাওয়া কোনটাই না করে যুক্তাহার হওয়া (৬।১৬-১৭)। যুক্ত মানে 'পরিমিত'। বুদ্ধদেবও বলতেন, 'আহারে যেন মাত্রাজ্ঞান থাকে'। যুক্ত বলতে যার চিত্ত নিঃস্পৃহ এবং অন্তর্মুখ তাকেও বোঝায় (৬।১৮; এইসঙ্গে তু. 'যুক্ত আসীত মৎপরঃ' ১৪)।

আহারের পর কর্ম। কর্ম বিকর্ম আর অকর্মের বিষয়ে অনেক-কিছু বোঝবার আছে—একথা শ্রীকৃষ্ণ আগেই বলেছিলেন। এখানে বিকর্ম আর অকর্মের কথা না বলে বিশেষ করে কর্তব্য কর্মের কথাই

বলছেন। তাঁর মতে যজ্ঞ দান এবং তপ—এই তিনটি কাজ কখনই ছাড়তে নাই—এ সবারই কর্তব্য, কেননা এতে মানুষের জীবন পবিত্র হয়। তবে কিনা এসব ভাল কাজও আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেই করা উচিত (১৮।৫-৬)। তাহলেই তারা হবে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার দ্বারা অনুপ্রাণিত (১৭।১১, ১৭, দীয়তেঽনুপকারিণে ২০)। অন্যথায় শ্রদ্ধাভেদে তারা হবে রাজস বা তামস (১৭।১২-১৩, ১৮-১৯, ২১-২২; তু. আসুরভাবের কর্ম ১৬।১২-১৫, ১৭)। ভাল কাজ হলেও এগুলি তখন বিকর্মের পর্যায়েই পড়ে।

দেবতার সাযুজ্যলাভের জন্য যজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞভাবনাকে বহুদূর সম্প্রসারিত এবং অন্তরাবৃত্ত করেছেন। তাঁর মতে ব্রহ্মলাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্মই যজ্ঞ (৪।৩২)। যেখানে ব্রহ্ম আর কর্মের সমাধি বা একতা (তু. ৪।২৩-২৫), সেখানেই যজ্ঞসাধনার পারম্য।

যেমন দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ হল দ্রব্যযজ্ঞ, তেমনি সর্বভূতের উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ হল দান। ছান্দোগ্যোপনিষদে দুটিকেই বলা হয়েছে ধর্মস্কন্ধ। দানই মানুষের পরম ধর্ম, মানুষের প্রতি প্রজাপতির অনুশাসন 'দত্ত' অর্থাৎ সবাইকে দাও—একথা বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে। ভাগবতে বলা হয়েছে, প্রয়োজনের অধিক যে সঞ্চয় করে রাখে, সে চোর, অতএব দণ্ড্য। মানুষের এই শুভবুদ্ধির উপরই সাত্ত্বিক সাম্যবাদের নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা হতে পারে। আধুনিক সাম্যবাদে এদিকটা অবহেলিত, তার অধিকাংশ ব্যাপ্রিয়াই রাজসী এবং তামসী শ্রদ্ধার দ্বারা প্ররোচিত।

ছান্দোগ্যে যজ্ঞ এবং দানকে যেমন একটি ধর্মস্কন্ধ বলা হয়েছে, তেমনি তপকে বলা হয়েছে আরেকটি। যজ্ঞ হল অধিদৈবত সাধনা, আর তপ অধ্যাত্ম সাধনা—দুয়ের মধ্যে এই সূক্ষ্ম ভেদটুকু আছে। তবে কিনা গীতায় দুটিই ওতপ্রোত। যজ্ঞের অনুষঙ্গেই ভগবান্ নিজেকে 'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং' বলে বর্ণনা করেছেন (৫।২৯)।

তপের মৌলিক অর্থ হল তাপবিকিরণ। বৈদিক ভাবনায় আদর্শ তপস্বান্ হলেন পৃথিবীতে অগ্নি, আর দ্যুলোকে সূর্য। সুতরাং নিজের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে 'যোগাগ্নিময়-শরীর' হওয়া অথবা সূর্যের ভাবনায় ঋষিকা অপালার মত 'সূর্যত্বচ্' হওয়া হল তপঃসিদ্ধির চরম। যোগসূত্রে অশুদ্ধিক্ষয়ের দ্বারা কায়েন্দ্রিয়ের সিদ্ধিকে বলা হয়েছে তপের ফল (২।৪৩)। ক্রিয়াযোগের তিনটি অঙ্গের প্রথম অঙ্গ হল তপঃ।

গীতায় তপকে সার্বজনীন করবার জন্য প্রথমেই তাথেকে অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্রতার দিকটা ছেঁটে ফেলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই বলছেন, 'যেমন রাজস আর তামস জনের যজ্ঞ দেবতাকে বাদ দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় যক্ষ-রক্ষ আর ভূত-প্রেতের উদ্দেশে, তেমনি আসুর-নিশ্চয়দের তপও হল নির্বোধের মত শরীরস্থ ভূতগ্রামকে কর্শন করে অন্তঃশরীরস্থ আমাকেই কষ্ট দেওয়া। এ ঘোর তপস্যা হতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রে এর বিধান নাই। এর মূলে আছে কাম আর আসক্তির প্রবেগ, দম্ভ, আর অহঙ্কার (১৭।৪-৬); আছে লোকের কাছে বাহবা মান আর পূজা পাওয়ার মতলব। এ-তপ হয় অন্যায় জেদের বশে আত্মপীড়ন, নয়তো অপরকে উচ্ছন্নে দেওয়ার একটা দুরাগ্রহ (১৭।১৮-১৯)।'

সত্যকার তপ হচ্ছে সাত্ত্বিক তপ—যা হল পরম শ্রদ্ধার বশে কোনও অবান্তর ফল না চেয়ে তপের জন্যই তপ করা (১৭।১৭)—সুস্থ এবং স্বাভাবিক রীতিতে। সে হল শরীর বাক্য এবং মনের মালিন্য দূর করা। তাই তপ তিনরকমের—শারীর, বাঙ্ময় এবং মানস।

শারীর তপ হল ব্রহ্মচর্য, শৌচ, অহিংসা এবং দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞের পূজন। আর তার জন্য 'আর্জব' বা লোকব্যবহারে ঋজুতার অনুশীলন। সোজাকথায় শরীরকে কাম-ক্রোধের বেগ থেকে মুক্ত রাখা (৫।২৩), শরীরচেতনাকে আকাশের মত নির্মল রাখা আকাশভাবনার দ্বারা, শরীর দিয়ে কারও পীড়া উৎপন্ন না

করা, আর তাকে দেবসেবায় এবং মহৎসেবায় নিযুক্ত রাখা—এই হল শারীর তপ। তার অনুশীলনে ব্যবহার সহজ সরল ও স্বচ্ছন্দ হয় —তা-ই হল 'আর্জব'। এটি একটি দৈবী সম্পদ (১৬।১)।

তারপর বাঙ্‌ময় তপ হল সত্যকথা বলা, মানুষের মনে উদ্‌বেগ জন্মে বা তার অহিত হয় এমন কথা না বলা, আর সব কথাই মিষ্টি করে বলা। এগুলি হল বাঙ্‌ময় তপের ব্যাবহারিক প্রকাশ। তার আসল সাধনা হল সংযমের দ্বারা বাককে অন্তরাবৃত্ত করে স্বাধ্যায়ে অর্থাৎ জপে এবং ভাবনায় নিযুক্ত রাখা। এটি বাঙ্‌ময় আর মানস তপের মাঝামাঝি, কেননা মৌন (১৭।১৬) হচ্ছে এর প্রধান সাধন।

আর মানস তপ হচ্ছে মৌন, আত্মবিনিগ্রহ, মনঃপ্রসাদ, ভাব-সংশুদ্ধি আর সৌম্যত্ব। মনের ভাবনাই বাকে প্রকাশ পায়। কথায় কথা বাড়ে। তা আবার ফিরে গিয়ে মনকে চঞ্চল করে। তাই কঠোপনিষদ বলছেন, যে প্রজ্ঞানের সাধক, তাকে সবার আগে বাক্‌কে গুটিয়ে আনতে হবে মনে। ক্রমে বাক্যহীন মননে অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভাবনায় নিজেকে অভ্যস্ত করতে হবে। এই তপের নাম হল মৌন। মৌনের অভ্যাসে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে আনা সম্ভব হয়—উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে মনকে জ্ঞান-আত্মায় নিয়মিত করা। অন্তর্মুখ মন তখন নিরন্তর আত্মভাবনায় অভ্যস্ত হয়। উপনিষদে একে বলে 'সমনস্কতা'। গীতায় অন্যত্র এর কথায় বলা হয়েছে, 'মন তো অস্থির চঞ্চল। তা সে যেখানেই যাক, সেখান থেকে টেনে এনে তাকে আত্মায় বসিয়ে দিতে হবে। এটি করতে হবে ধৃতিগৃহীত বুদ্ধির সাহায্যে। অবশেষে মন যখন আত্মসংস্থ হবে, তখন আর কোনও চিন্তাই থাকবে না' (দ্র. ৬।২৫-২৬)। আত্মায় নিগৃহীত মন তখন প্রসন্ন হবে, এক উত্তম সুখে ছেয়ে যাবে (তু. ৬।২৭)। একে বলে মনঃপ্রসাদ, যাতে বুদ্ধিযোগ সিদ্ধ হয় (তু. ২।৬৪-৬৫)। তখন ভাব শুদ্ধ হয়, যাকে আগে বলা হয়েছে সত্ত্ব-

সংশুদ্ধি (১৬।১)। ভাব শুদ্ধ হলে মনের বৃত্তিগুলি একতান হয়ে একটা আবেগের সৃষ্টি করে—যার মধ্যে মননের তরঙ্গ থাকে না, থাকে অনুভবের একটানা একটা প্রবাহ। এরই ফল হল 'সৌম্যত্ব' —একটা আনন্দের আভা ভিতর থেকে ছড়িয়ে পড়ে সুষম ও স্বচ্ছন্দ বাকে এবং ব্যবহারে।

প্রশ্ন

'ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ' (১৭।২৩)। ব্রহ্মের ত্রিবিধ সাঙ্কেতিক নামের রহস্য কি? গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের (১৭।২৪, ২৫, ২৬, ২৭) ৪টি শ্লোকে 'ওঁ তৎসৎ'এর যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

উত্তর

আগেই বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের মতে যজ্ঞ দান এবং তপ এই তিনটি কর্ম কখনও ছাড়তে নাই—এগুলি শ্রদ্ধাসহকারে (তু. ১৭।২৮) সবারই অনুষ্ঠেয়। কিন্তু করতে হবে কার উদ্দেশে।

কর্ম করে প্রকৃতি—সে কর্ত্রী ; আর তার ফলভোগ করে পুরুষ— সে ভোক্তা (তু. ১৩।২০)। এটি সাধারণ নিয়ম। তাহলে বলা যায়, মনীষীদের পাবন বলে যে যজ্ঞ দান এবং তপ সমস্ত কর্মের শ্রেষ্ঠ, তাও আমাদের মধ্যে থেকে পরা প্রকৃতি করে যায় পরম-পুরুষের উদ্দেশে। এই পুরুষকে বলা হয় ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা পুরুষোত্তম—এককথায় 'ঈশ্বর'। সমস্ত কর্মই করা উচিত ঈশ্বরার্থে —আসক্ত হয়ে বা স্বার্থের প্ররোচনায় নয়। ঈশ্বরই আমাদের যজ্ঞ দান এবং তপের ভোক্তা (৫।২৯)। তিনি নিজেও বলছেন, 'তুমি যা কর, যা খাও, যা আহুতি দাও, যা দান কর, যে-তপস্যা কর —সব আমাতে সমর্পণ করবে (৯।২৭)।'

এই বুদ্ধিতে কাজ করলে সব কাজই হয়ে ওঠে তাঁর মধ্যে আত্মাহুতি, কর্ম আর যজ্ঞ এক হয়ে যায়। যাঁর উদ্দেশে এই কর্ম-

যজ্ঞ, 'ওম্ তৎ সৎ' এই তিনটি বেদমন্ত্র তাঁর বাচক। অতএব যে-কোনও কর্ম করবার আগে এই তিনটি মন্ত্র একসঙ্গে বা পৃথক্-পৃথক্ উচ্চারণ করে তাঁকে হৃদয়ে বসিয়ে তাঁর উদ্দেশে কর্ম করা উচিত। কর্ম তখন তাঁর অর্চনা (১৮।৪৬)।

ওম্ ব্রহ্মের বাচক, যোগে ঈশ্বরের বাচক। ওম্ একটি অসঙ্কেতিত শব্দ—চিদাকাশে একটা ঝঙ্কার, যা কোনও কৃত্রিম সঙ্কেত বহন করে না, অথচ যা সর্বজীবে 'সোঽহম্' এই সহজ ভাবনার বাহন। নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে এই মন্ত্র আপনাহতে সবার মধ্যে উচ্চারিত হয়ে চলেছে। অন্তরাবৃত্ত চেতনার দ্বারা নিজের মধ্যে একে আবিষ্কার করে মৃত্যুকালে এই নাদের আশ্রয়ে দেহত্যাগের কথা শ্রীকৃষ্ণ আগেই বলেছেন (৮।১০-১৩)।

এই ওঙ্কার শব্দব্রহ্ম। উপনিষদে বলা হয়েছে, এই ওঙ্কারই সব। আবার ব্রহ্মই সব। আমাদের এই আত্মাও ব্রহ্ম। ওঙ্কার ব্রহ্ম আর আত্মা এক। আত্মা চতুষ্পাৎ, ব্রহ্মও তা-ই, ওঙ্কারও তা-ই। ওঙ্কারের তিন পাদে আছে আমাদের জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির দ্বারা উপলব্ধব্য সব-কিছু, আর তার চতুর্থপাদে প্রপঞ্চের উপশম—সেখানে সব 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্'।

এইটিই অক্ষরব্রহ্মের তত্ত্ব। তার বাচক ওই দুটি মন্ত্র, তৎ এবং সৎ। যা-কিছু আমাদের অনুভবগোচররূপে বর্তমান, বেদে তাকে বলা হয় 'সৎ'। আমাদের অনুভবের বাইরে যা, আপাতদৃষ্টিতে তা আমাদের কাছে 'অসৎ'—কিন্তু সে যে একেবারেই নাই তা নয়। তা কি তা আমরা জানি না, বুঝি না, বলতে পারি না—অথচ তার অনির্বচনীয় অস্তিত্বকে অস্বীকার করতেও পারি না। বেদে একে বলা হয়েছে 'তৎ' বা 'ত্যৎ'।

পরমার্থতত্ত্বকে সংহিতায় বলা হয়েছে কোথাও 'একং সৎ', কোথাও-বা 'একং তৎ'। দুটি একই তত্ত্বের এপিঠ-ওপিঠ। উপনিষদে তাই

বলা হল, তাঁকে বলি 'সৎ-ত্য'—কেননা তিনি একাধারে 'সৎ' বা বিশ্বাত্মক এবং 'তৎ' বা বিশ্বোত্তীর্ণ।

এই ভাবনাগুলিই গীতা কর্মানুষ্ঠানে বা 'যজ্ঞদানতপঃক্রিয়া'য় প্রয়োগ করতে বলছেন। তিনটি মন্ত্রের প্রয়োগে সামান্য-কিছু ইতরবিশেষ আছে।

যাঁরা ব্রহ্মবাদী—কেবল 'বেদবাদরত' নন, তাঁরা বেদ-বিধানানুযায়ী কর্ম করবেন যখন, তখন ওঙ্কারের ভাবনা করবেন। এ-রীতি প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে। উপনিষদ বলেন, ওঙ্কারের নীচের তিনটি মাত্রা মৃত্যুমতী, অতএব তার ভাবনায় সাবধান হতে হবে। তার চতুর্থ মাত্রা 'অজর অমৃত এবং অভয়'। এই মাত্রাতে অবিকম্পিত থেকে যদি আর-তিনটি মাত্রার প্রয়োগ করা হয় সমস্ত ক্রিয়াতে, তাহলে সে-প্রয়োগ সম্যক্ হয় (প্র. প্র. ৫।৬-৭)।

তাহলে ওঙ্কারভাবনাপূর্বক কর্ম করা একটি সাধারণ বিধি হতে পারে। সর্বদা সমনস্ক এবং সাক্ষীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে দৃষ্টি রেখে এর অনুশীলন করা সম্ভব।

যাঁরা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী, তাঁরা কোনও ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে যজ্ঞ দান বা তপের কাজ করে যাবেন 'তৎ'এর ভাবনা সহ। সে-কাজ কোনও ধরা-বাঁধা কাজ নয়—'বিবিধ' কাজ। যখন যা এসে সামনে উপস্থিত হচ্ছে, সে-ই কাজ। করছি 'উদাসীনবৎ আসীন' হয়ে (৯।৯, ১৪।২৩, তু. 'সর্বারম্ভপরিত্যাগী' যে কোন-কিছু ঘটিয়ে তোলে না ১২।১৬)। 'তৎ'এর ভাবনা এই স্থিতির অনুকূল।

'সৎ' শব্দের আবার দুটি অর্থ—যা 'আছে' তা যেমন সৎ, তেমনি যা 'ভাল' তাও সৎ। সৎকাজ অর্থাৎ 'প্রশস্ত' বা ভাল কাজ করবে—এটা হল ধর্মের অনুশাসন। প্রথমটায় এই অনুশাসন মেনে কাজ করাই সবার উচিত। ওতে যজ্ঞ দান এবং তপে 'স্থিতি' হয়—ওতে নিষ্ঠা জন্মে, অভ্যাসে ওগুলি স্বাভাবিক হয়ে যায়। 'সৎ'এর ভাবনা এইভাবে কাজ করার অনুকূলে।

তবে আসল কথা হচ্ছে, যে-কাজ আমরা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা নিয়ে করি, তা-ই সৎকাজ (দ্র. ১৭।৪, ৮, ১১, ১৭, ২০)। যা অশ্রদ্ধায় করা হয়, তা-ই অসৎ কাজ, তাতে ইহকাল-পরকাল দুইই যায় (১৭।২৮)।

কিন্তু একটা সময় আসে, যখন আর ধর্মাধর্মের প্রশ্ন থাকে না। অনুভব করি, ঈশ্বর হৃদয়ে যন্ত্রী হয়ে বসে আমায় যন্ত্রের মত ঘোরাচ্ছেন (১৮।৬১)। তখন কোন্ কাজ সৎ আর কোন্ কাজ অসৎ, তা তিনিই জানেন—আমি তাঁর কর্মের নিমিত্তমাত্র (দ্র. ১১।৩৩)। তখন 'যষ্টব্যম্ ইতি' (১৭।১১), 'দাতব্যম্ ইতি' (১৭।২০), 'তপ্তব্যম্ ইতি' ইত্যাকার কর্তব্যবোধও থাকে না। তখন অন্তর্যামীর নির্দেশে যে-কাজ করি, তার মূলে যে-শ্রদ্ধা তা গুণাতীত। উপনিষদে এমনি করে পাপ-পুণ্যবোধের অতীত হয়ে কাজ করার কথাও আছে। 'ওঁ তৎ সৎ' এই মহাবাক্যটি সমগ্রভাবে তখনই সার্থক।

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রশ্ন

'যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে' (১৮।৩), 'যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্' (১৮।৫)। উপরোক্ত শ্লোকগুলির রহস্যার্থ কি? যজ্ঞ, দান এবং তপস্যার অনুশীলন কি আমরণ করিতে হইবে?

উত্তর

দ্বিতীয় অধ্যায় হতে (২।১১) গীতার অনুশাসন আরম্ভ হয়েছিল, অষ্টাদশ অধ্যায়ে এসে তা শেষ হল। অনুশাসনের উপক্রমে আর উপসংহারে যে-সঙ্গতি আছে, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কুরুক্ষেত্রে সব্যসাচীর প্রতি এই অনুশাসন; আর তার অধিকার পরিব্যাপ্ত সমস্ত জীবনে—এই কথাটি মনে রাখতে হবে। কুরুক্ষেত্র 'ঘোর কর্মে'র ক্ষেত্র (৩।১)। আমাদের সমস্তটা জীবনই দৈব এবং আসুরনিশ্চয়ের সংঘর্ষে একটা কুরুক্ষেত্রবিশেষ। গীতার শিক্ষাকে সার্থক করতে হবে এই কুরুক্ষেত্রে—অন্তরের জ্ঞান আর ভক্তিকে রূপ দিতে হবে জীবনের কর্মে। গীতায় এই তিনটি যোগের এক মহা-সমন্বয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্মকে দেখা হয়েছিল জ্ঞানের দিক থেকে—যোগস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের কর্ম সেখানে কর্মের আদর্শ। অষ্টাদশ অধ্যায়ে সেই কর্মযোগে যুক্ত হল ভক্তি, আর তিনটি যোগের সমন্বয়ে 'কর্মজা সিদ্ধি'র পরম রূপটি প্রকটিত করা হল (১৮।৪৫-৪৬; প্রতি তু. ৪।১২)। তারপর সাংখ্যের গুণত্রয়বিভাগের দৃষ্টিতে সেই যোগ-ভাবনাকে প্রয়োগ করা হল সমগ্র সমাজসংস্থানে (১৮।৪০-৪৪)। এমনি করে পাওয়া গেল মানবজাতির একটি অখণ্ড জীবনাদর্শ।

জীবন কর্মে বিধৃত। কর্মকে রূপান্তরিত করতে হবে 'যজ্ঞে'। তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে 'দান', যার মূলে রয়েছে সর্বভূতের প্রতি মৈত্রী; আর যুক্ত করতে হবে 'তপ', যার পরিণাম হল আত্ম-

সংযমনজনিত ভাবসংশুদ্ধি। যজ্ঞ দান এবং তপ—এই তিনটি হল কর্মের আদর্শ। এদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আগেই করা হয়েছে।

যজ্ঞ দান এবং তপও দৈবসর্গের স্বভাবজ কর্ম। যা স্বভাবজ, তার অনুশীলন আমরণই করতে হবে—তার ত্যাগ কখনও উচিত নয়।

তবে ত্যাগও সাত্ত্বিক রাজসিক এবং তামসিক ভেদে তিনরকম। মোহবশে ত্যাগ তামসিক, আর কায়ক্লেশভয়ে ত্যাগ রাজসিক। সাত্ত্বিক ত্যাগ হল কর্মে আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ (১৮।৫, ৭—৯)।

কেউ-কেউ বলেন, কর্মমাত্রেই সদোষ, কেননা তা বন্ধনের কারণ। অতএব সব কর্মই ত্যাজ্য। কিন্তু একথা ঠিক নয়। যজ্ঞ দান এবং তপ কোনকারণেই ত্যাজ্য নয় (১৮।৩)। অবশ্য এসবও আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে করা উচিত (১৮।৪—৬)।

কর্মসন্ন্যাস বলে একটা কথা আছে, যার আরেক নাম নৈষ্কর্ম্য। অনেকে বলেন, তাতেই সিদ্ধি। কিন্তু কর্ম ত্যাগ করলেই সিদ্ধি হয় না। সিদ্ধি হয় কর্মের ফলত্যাগে। কর্মত্যাগ সম্ভবও নয়, কেননা কর্ম না করে কেউ থাকতেই পারে না—প্রকৃতি সবাইকে অবশে কর্ম করিয়ে নেয়। কাজেই কর্ম করতেই হবে—কিন্তু তাতে আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে। সমস্ত কর্মের ফলত্যাগই হল যথার্থ ত্যাগ (৩।৪-৫, ১৮।২, ১১)।

লোকে কাম্য কর্ম করে ফলাকাঙ্ক্ষা নিয়ে। অনেকে বলেন, কাম্য কর্ম করা উচিত নয়; আর তা-ই হল কর্মসন্ন্যাস (১৮।২)। কিন্তু কথাটা খুব গভীর নয়। বাইরে-বাইরে কর্ম করা বা ছাড়া কোনটাই বড় কথা নয়। আসল কথা হল, ভিতর থেকে কর্মফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষাটুকু ত্যাগ করা। কর্মফলের কোনও পরোয়া না করে যে তার করণীয় কাজ করে যায়, সে-ই যথার্থ কর্মসন্ন্যাসী এবং কর্মযোগী—যে যজ্ঞ না করে 'নিরগ্নি' আর কর্ম না করে 'অক্রিয়',

সে কর্মসন্ন্যাসী নয় (৬৷১)। অবশ্য কর্মসন্ন্যাস আর কর্মযোগ —দুইই নিঃশ্রেয়সের হেতু। তবু কর্মসন্ন্যাস হতে কর্মযোগের একটা বিশিষ্টতা আছেই (৫৷২)—কেননা কর্মযোগ হল একটা অখণ্ড জীবনদর্শন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যার আদর্শ ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর জীবনে (তু. ৩৷২০—২৪)। কর্মফলে যার আকাঙ্ক্ষা নাই এবং কোনও কর্মের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ নাই (৫৷৩)—এমন-কি অকুশল কর্মের প্রতি দ্বেষ আর কুশল কর্মের প্রতি পক্ষপাতও যার নাই, সে-ই যথার্থ কর্মসন্ন্যাসী এবং ত্যাগী। তাকে বলা চলে 'নিত্যসন্ন্যাসী' —সে নিত্যসত্ত্বস্থ, অতএব কর্মতত্ত্বের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট, কর্মসম্পর্কে কোনও সংশয়ের দোলা তার মধ্যে নাই। সে নির্দ্বন্দ্ব, আর কর্মের ইষ্ট অনিষ্ট এবং ইষ্টানিষ্ট এই তিনরকম ফলের বন্ধন হতে অনায়াসেই মুক্ত (৫৷৩, ১৮৷১০, ১২)।

প্রশ্ন

সর্বভূতে অব্যয়-ভাব দর্শনটা কিরূপ? বিভক্তের মধ্যে অবিভক্তকেই বা কিরূপে দেখিতে হইবে (১৮৷২০)? পরিষ্কার ধারণা হয় যাহাতে, সেইরূপ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর

এখানে যে-জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, তা কর্মের প্রচোদক জ্ঞান (১৮৷১৮) এবং তা সমস্ত কর্মের অধিষ্ঠান (১৮৷১৪)। একদিকে এই অধিষ্ঠান-জ্ঞান, আরেকদিকে কর্মের ব্যাপ্রিয়ায় দৈবের খেলা—এই দুয়ের মধ্যে চলছে কর্তা করণ এবং কর্মচেষ্টাকে আশ্রয় করে সংসারের যত কর্ম (১৮৷১৩, ১৪, ১৮)।

এই অধিষ্ঠান থেকেই কর্মের প্রবর্তনা আসে (যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্ ১৮৷৪৬)। অধিষ্ঠানতত্ত্বটি ভাল করে না জানলে কর্মযোগ সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সাধারণত এই জ্ঞান প্রকাশ পায় গুণের ভিতর দিয়ে। যদি জ্ঞানটি সত্ত্বগুণপ্রণোদিত হয়, তাহলেই তা সিদ্ধির অনুকূল হয়।

জ্ঞান সাত্ত্বিক হয়, যখন ভাবের সঙ্গে ভূতের সম্পর্কের ধারণাটি সামগ্রিক এবং সুস্পষ্ট হয়। মূলে এক ভাব—বেদে যাকে বলা হয়েছে 'একং সৎ', গীতাতেও বলা হয়েছে 'য়েন সর্ব্বম্ ইদং ততম্' (১৮।৪৬, ২।১৭) যিনি সব-কিছু ছেয়ে আছেন। এই এক ভাব নিজেকে ব্যাক্ত করছেন বহু ভূতে। যেখানেই বহুত্ব, সেখানেই ভেদজ্ঞান। কিন্তু ভেদজ্ঞান যদি অভেদজ্ঞানের কুক্ষিগত হয়, তাহলে দৃষ্টির বিপর্যয় ঘটে না। একই সমুদ্রের বুকে কত ঢেউএর ওঠা-পড়া—কিন্তু গভীর সমুদ্র নিস্তরঙ্গ। তেমনি ভুবনে-ভুবনে ভূতগ্রামের উৎপাদ-স্থিতি-ভঙ্গের বিচিত্র বিভঙ্গ, কিন্তু মূলে সেই এক অব্যয় অভঙ্গের অধিষ্ঠান—এই দৃষ্টিই সত্যদৃষ্টি, এই জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান। সাত্ত্বিক জ্ঞান সর্বত্র একেকে দেখে, রাজস জ্ঞান একেকে না দেখে ছাড়া-ছাড়াভাবে দেখে বহুকে, আর তামস জ্ঞান সেই বহুর মধ্যে একটিকে বেছে নিয়ে তাকেই সর্বস্ব করে তোলে এক মূঢ় অভিনিবেশে। একটি জ্ঞান স্থির এবং সমগ্রদর্শী, তার কর্মও সুস্থির এবং ফলের দিক দিয়ে বিশ্বের মূলভাবের সঙ্গে যুক্ত। আর দুটি জ্ঞানের একটি চঞ্চল, আরেকটি মূঢ়। তাদের কর্মও তা-ই।

প্রশ্ন

সাত্ত্বিক কর্তার লক্ষণগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়। 'অনহংবাদী' কি করিয়া হওয়া যায়? সর্বদাই তো 'অহং' 'অহং' এই ধ্বনি উঠিতেছে প্রতি কর্মে। সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে চিত্তের সমভাব রাখা যায় কেমন করিয়া (১৮।২৬)? সাত্ত্বিক কর্তাই তো জীবনের আদর্শ?

উত্তর

ঈশ্বরই কর্মের অধিষ্ঠান—সর্বভূতের হৃদয়ে থেকে কর্মের যন্ত্রে তাদের চড়িয়ে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছেন (১৮।৬১)। তিনিই সব করান, আমরা তাঁর নিমিত্তমাত্র। (তু. ময়ৈব নিহতাঃ ১১।৩৩)। সর্ব-

ভূতের সমস্ত কর্মপ্রবৃত্তি উৎসারিত হচ্ছে তাঁহতে (১৮।৪৬)। অহং ছাড়া কর্ম হয় না। কিন্তু আমার কর্ম তাঁরই কর্ম, আমার অহং তাঁরই অহং—এই বুদ্ধি যার হয়, সে 'অহংবাদী' হয়ে কেবল 'অহং অহং' করে না আসুরনিশ্চয়দের মত (তু. ১৬।১৩—১৫)। ভিতরে-ভিতরে সে বোঝে, ন্যায্য বা অন্যায্য যে-কাজই হ'ক না কেন, তা অধিষ্ঠানরূপী পুরুষ আর দৈবরূপিণী প্রকৃতির যোগাযোগে কর্তৃত্ব কর্তা করণ আর কর্মচেষ্টার একটা জালবুনানি—এর মধ্যে তার অহংকার করবার কিছুই নাই (১৮।১৪, ১৫, ১৭)। অধিষ্ঠান সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত সাত্ত্বিক জ্ঞান হতে এই অনহংবুদ্ধি জন্মায়।

যে অনহংবাদী, তার কর্মে বা কর্মফলে কোনও পক্ষপাত বা আসক্তি থাকে না। সে মুক্তসঙ্গ। অথচ সে সমস্ত কর্ম ছেড়ে দিয়ে তথাকথিত নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির দিকেও ঝোঁকে না (তু. ৩।৪-৫)। সে তার 'নিয়ত' কর্ম ঠিক করে যায় এবং ধৃতি আর উৎসাহের সঙ্গেই তা করে। ধৃতির কথা পরে বলা হচ্ছে। তার যে-কাজ করবার, নিষ্ঠার সঙ্গে নিপুণভাবে তা সে করে—কিন্তু তা নিষ্ফল হলে যেমন সে মুষড়ে পড়ে না, তেমনি সফল হলেও আহ্লাদে আটখানা হয় না। কেননা সে জানে কর্মের ফলাফল সম্পর্কে মানুষ একটা আন্দাজ মাত্র করতে পারে, কিন্তু নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারে না। যদি অন্তর্যামী কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগ থাকে, তাহলে তাঁর নিমিত্ত হয়ে কর্ম করার আত্মপ্রসাদই হয় কর্মের সাক্ষাৎ সুফল—আর বাইরের ফলাফলটা পড়ে ওই দৈবের এলাকায়। দৈবও অবশ্য অধিষ্ঠান-পুরুষের সঙ্কল্পকেই সিদ্ধ করে—কিন্তু সোজাসুজি তা করে না সবসময়। কেন করে না, তার কৈফিয়ত সে কাউকে দেয় না, দেবার উপায়ও নাই। কেননা কর্ম এ-ক্ষেত্রে জড়ের যান্ত্রিক ব্যাপার নয়—প্রাণ ও চেতনার লীলা। তার আইন-কানুন এত জটিল যে তা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। তাই কর্মের ফলকে বাইরে রেখে বোঝবার চেষ্টা না করে, অন্তরে সে কতখানি সার্থক হল, তা দেখেই

তার বিচার করা দরকার। অর্থাৎ কর্মে প্রজ্ঞানের কতখানি উন্মেষ হল, সেটাই লক্ষণীয়—বাইরে আমাদের মনঃকল্পিত সার্থকতা যদি তার নাও ঘটে, তার জন্য দুঃখ করতে নাই। এমনি করে সিদ্ধি আর অসিদ্ধিতে নির্বিকার হয়ে ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত সাত্ত্বিক কর্তা হওয়া যায়।

সাত্ত্বিক কর্তা অবশ্যই জীবনের আদর্শ। কিন্তু তাঁর পিছনে অধিষ্ঠান রয়েছে সেই 'কৃৎস্নকর্মকৃৎ'এর, যিনি কর্মে অকর্ম আর অকর্মে কর্ম দেখেন (৪।১৮)।

সাত্ত্বিক কর্তার কর্মও সাত্ত্বিক। সে-কর্ম 'নিয়ত' কিনা নির্দিষ্ট এবং পূর্বনিরূপিত, 'সঙ্গরহিত' বা আসক্তিশূন্য, তাতে অনুরাগ-বিরাগের দ্বন্দ্ব বা ফলাকাঙ্ক্ষা নাই (১৮।২৩)।

প্রশ্ন

অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৩০ শ্লোকে সাত্ত্বিকী বুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে। শ্লোকটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়। সাত্ত্বিকী বুদ্ধি লাভের জন্য আমাদের কি করিতে হইবে ?

উত্তর

'বুদ্ধি'র ভাবনা গীতার একটি বৈশিষ্ট্য। শব্দটি এসেছে বুধ্ ধাতু থেকে—বেদে যার অর্থ 'জেগে ওঠা'। অগ্নি 'উষর্ভুৎ' কিনা উষার আলোয় জেগে ওঠেন। তার পরেই আকাশের অন্ধকার এবং রক্তচ্ছটা কাটিয়ে সূর্যের উদয় হয়। সূর্য প্রজ্ঞানের প্রতীক—তেমনি উষার আলো শ্রদ্ধা এবং প্রাতিভসংবিৎএর। অগ্নি বোঝাচ্ছে অধূমক আত্মচৈতন্যকে। উষার আলোয় অগ্নির জেগে ওঠার তাৎপর্য এথেকেই স্পষ্ট হবে।

বুদ্ধি তাহলে চেতনার একটা নব-জাগরণ। প্রাচীন উপনিষদে সংজ্ঞাটির ব্যবহার নাই—আছে বিশেষ করে কঠোপনিষদে। সেখানে বুদ্ধি আর বিজ্ঞান সমার্থক। বিজ্ঞান মনের ওপারে, বেদে

তার প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা 'মনীষা'। মন পর্যন্ত ইন্দ্রিয়ের অধিকার (১৫।৭), তার ওপারে বুদ্ধি। তাই বুদ্ধি 'অতীন্দ্রিয়' (৬।২১)। কেনোপনিষদে একে বলা হয়েছে 'প্রতিবোধ' যা মনের উজানে বিদ্যার একটি বিশিষ্ট সাধন। বেদে 'বোধিন্মনঃ' বলে একটি কথা আছে, তাও এই-জাতীয়। গীতার বুদ্ধি এদেরই সগোত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বুদ্ধির কথা বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে, 'বুদ্ধিযোগে'র উল্লেখও সেখানে আছে (২।৪৯—৫৩, ৬৫-৬৬)। দশম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, বুদ্ধিযোগ ভগবানের দান, যা ভাস্বর জ্ঞানের আলোয় অজ্ঞানান্ধকার দূর করে (১০।১০-১১)। এই বুদ্ধিযোগকে আশ্রয় করে সবসময় চিত্তটি ভগবানের উপর ফেলে রাখার কথা এই অধ্যায়েও আছে (১৮।৫৭)।

বলা বাহুল্য, এই বুদ্ধি—যার অন্যান্য নাম বোধি, প্রতিবোধ, মনীষা বা বিজ্ঞান—তা স্বরূপত গুণাতীত। পুরুষের এটি সহজ ধর্ম। কিন্তু প্রকৃতিতে তার প্রকাশ হয় গুণের ভিতর দিয়ে। কাজেই গুণময়ী বুদ্ধিও আছে। এখানে তার কথাই বলা হয়েছে। এই বুদ্ধি প্রকাশ পায় মনের ভিতর দিয়ে। তখনই মনের মধ্যে দেখা দেয় বোঝার ব্যাপার। বোঝাপড়া হল মনের কাজ। মন তত্ত্ব জানে না, কিন্তু জানতে চায়। জানতে গিয়ে নিজেকে যেখানে সে ছাড়িয়ে যায়, সেইখানেই শুরু হয় বুদ্ধির ক্রিয়া।

বুদ্ধির মধ্যে একটা ব্যাপকতা আছে। মনের কারবার হল বিশেষপ্রত্যয় নিয়ে—যা নির্ভর করে ইন্দ্রিয়সংবিৎএর উপর। বুদ্ধির কারবার সামান্যপ্রত্যয় নিয়ে—যা নির্ভর করে ভাবনার উপর। মন জীবনটাকে দেখে খণ্ড-খণ্ড করে। বুদ্ধি তাকে দেখে সমগ্রভাবে।

বুদ্ধির এই সমগ্র দৃষ্টিতে জীবনে প্রকৃতি-পরিণামের দুটি ধারা দেখা দেয়—একটি প্রবৃত্তি এবং অকার্যের ভিতর দিয়ে মানুষকে নিয়ে যায় বন্ধনের দিকে, আরেকটি নিবৃত্তি এবং কার্যের ভিতর দিয়ে নিয়ে যায় মোক্ষের দিকে। একটি ধারার শেষে মৃত্যুভয়,

আরেকটির শেষে অভয় অমৃত। এর আগে এই দুটি ধারাকে যথাক্রমে বলা হয়েছে আসুরসর্গ এবং দৈবসর্গের ধারা (১৬।৫)।

দুটি ধারার দোষ-গুণ পর্যালোচনা করে দৈবসর্গের ধারাকে বেছে নেওয়া হচ্ছে সাত্ত্বিকী বুদ্ধির কাজ। সে মনকে বলে চেতনাকে অন্তর্মুখ করতে, তার স্বভাবানুকূল নিয়ত কর্ম কি তা বুঝে নিতে এবং অনহংকৃত আর ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে সেই কর্ম করে নিজেকে কর্মবন্ধন হতে মুক্ত করতে (তু. ৩।৯, ৪।১৯, ৩৩, ৩৭, ৫।১১...)।

রাজসী বুদ্ধি জীবনের লক্ষ্যকে এমন স্বচ্ছ করে দেখতে পায় না, তার কাছে সব-কিছু এলোমেলো হয়ে দেখা দেয়। আর তামসী বুদ্ধি সব-কিছু একেবারে উল্টা বুঝে বসে (১৮।৩১, ৩২)। বলা বাহুল্য, এই দুটি বুদ্ধি আসুরনিশ্চয়ের অনুকূল।

সাত্ত্বিকী বুদ্ধি পেতে হলে দৈবী সম্পদে অভিজাত হতে হবে (১৬।১—৩)। তার কথা বিস্তারিতভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে।

প্রশ্ন

মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে নিয়মিত করা যায় সাত্ত্বিকী ধৃতি দ্বারা (১৮।৩৩)। সাত্ত্বিকী ধৃতির একটু বিশ্লেষণ করিবেন কি? ধৃতিশক্তি বাড়াইবার উপায় বা সাধন-পন্থা কিছু আছে কি?

উত্তর

বুদ্ধি আর ধৃতি ওতপ্রোত (তু. ধৃতিগৃহীতা বুদ্ধি ৬।২৫)। বুদ্ধি দিয়ে যা বুঝলাম, ধৃতি দিয়ে তাকে আমরা ধরে থাকি। আমরা ধরে থাকি তা-ই, যাতে রস পাই। সেটা নির্ভর করে রুচি সংস্কার অভ্যাস ইত্যাদির উপর। ধৃতি চিত্তের একটি মৌল শক্তি।

বুদ্ধির মত গুণভেদে ধৃতিরও ভেদ হয়। সাত্ত্বিকী ধৃতির মূলে আছে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। সে-বুদ্ধির প্রধান লক্ষণই হচ্ছে 'নিবৃত্তি'

বা অন্তরাবৃত্তি। এটি যোগেরও বৈশিষ্ট্য। ভোগ যেমন প্রবৃত্তির ধারা ধরে বাইরে ছোটে, যোগ তেমনি নিবৃত্তির ধারা ধরে অন্তরে ডোবে। যোগীর ইন্দ্রিয় প্রাণ ও মনের ক্রিয়া সবসময় অন্তর্মুখী। অবশ্য সবসময় অন্তর্মুখ থাকা সহজ নয়, তার জন্য দীর্ঘকাল ধরে নিরন্তর অভ্যাস চাই। এই অভ্যাসের জন্যই দরকার হয় ধৃতির। আর সে-ধৃতিকে পুষ্ট করে বুদ্ধি। সে বারবার বুঝিয়ে দেয়, ও পথে নয়—এই পথে।

সব ধৃতিই স্বভাবত নাছোড়বান্দা। সাত্ত্বিকী ধৃতি যেমন অনির্বিণ্নচিত্ত হয়ে দৃঢ়নিশ্চয়সহকারে যোগের পথে লেগে থাকে (তু. ৬।২৩), তেমনি রাজসী ধৃতি মজে ভোগে, আর তামসী ধৃতি মোহে (১৮।৩৪, ৩৫)। গুণের ক্রিয়া ব্যামিশ্র বলে সাত্ত্বিকী ধৃতির মধ্যেও রাজসী আর তামসী ধৃতি উঁকিঝুঁকি দেয়—পুরাণো সংস্কার এসে বারবার চিত্তকে নীচে নামিয়ে আনে। তার হাত থেকে রেহাই পাবার একটি উপায় হচ্ছে 'যোগধারণা'কে আশ্রয় করে মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ রেখে প্রাণের ধারাকে মনের দিকে উজিয়ে দেওয়া (দ্র. ৮।১২)। এখানে ধৃতি পতঞ্জলির ষষ্ঠ যোগাঙ্গ ধারণার সগোত্র। এটি প্রথমে অভ্যাস করতে হয় আসনে সমশিরঃকায়গ্রীব হয়ে (দ্র. ৬।১৩) মেরুদণ্ডস্থিত 'সুষুম্ণ' সূর্যরশ্মির ভাবনা সহকারে। সূর্যরশ্মির একটি মেরু থাকবে হৃদয়ে, আরেকটি মূর্ধার উপরে মহাশূন্যে। দুয়ের মধ্যে চলবে একটি জ্যোতির্ধারার ওঠা-নামা। অভ্যাসে এই ভাবনার সংস্কার উৎপন্ন হলে মন আর হৃদয়ের নীচে নামতে চায় না। তখনই সাত্ত্বিকী ধৃতি সহজ হয়।

প্রশ্ন

'আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ' কথাটার অর্থ কি ? 'অগ্রে বিষমিব' এবং পরিণামে অমৃতের মত সেই সুখকেই সাত্ত্বিক সুখ (১৮।৩৭) বলা হইয়াছে। সাত্ত্বিক সুখের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়।

উত্তর

বর্তমান প্রসঙ্গ শুরু হয়েছিল কর্মের কথা দিয়ে। শ্রীকৃষ্ণ বলছিলেন, কর্ম করতেই হবে। কর্ম কখনও ছাড়তে নাই—বিশেষত যজ্ঞ দান এবং তপঃকর্ম। তবে কিনা কর্ম করতে হবে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে অখণ্ডের জ্ঞান নিয়ে। তবেই সে-কর্ম হবে সাত্ত্বিক কর্ম (১৮।২৩), আর কর্তা সাত্ত্বিক কর্তা। সাত্ত্বিক কর্মে বুদ্ধিও সাত্ত্বিক হবে। আর এই সাত্ত্বিক বুদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে দেখা দেবে সাত্ত্বিক ধৃতি, যা রয়েছে অব্যভিচারী যোগ বা 'নিত্য যোগের' (দ্র. নিত্যযুক্ত ৯।১৪, ১২।২) মূলে। এই নিত্যযোগের ফলে সব দুঃখ দূর হয়ে যায়, জাগে এক অনুপম সুখ (তু. ৬।২৩, ২৭)। এখন সেই সুখের কথা বলা হচ্ছে, যা আমাদের জীবনে পরম পুরুষার্থ।

লক্ষণীয়, উপনিষদে 'আনন্দ' সংজ্ঞার বহুল প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও, গীতায় এ-সংজ্ঞাটি নাই—তার জায়গায় আছে 'সুখ' এবং 'প্রসাদ'। সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বের সঙ্গে আমরা পরিচিত, গীতাতেও তার অনেক উল্লেখ আছে। তাই দুঃখশূন্য সুখ বোঝাতে গীতায় পাই 'অক্ষয়' 'অত্যন্ত' 'আত্যন্তিক' বা 'উত্তম' সুখের কথা (৫।২১, ৬।২৮, ২১, ২৭)। গীতায় এই সুখের আরেক নাম 'প্রসাদ'। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে (২।৬৪-৬৫)। উপনিষদে সুষুপ্তিকালীন সুখকে বলা হয়েছে 'সম্প্রসাদ'। এই ভাবনাগুলি সুখ-দুঃখের দোলার ঊর্ধ্বে আকাশের মত একটি প্রশান্ত অনুভবের ইঙ্গিত করে। এই সুখ আত্মার বা ব্রহ্মের স্বরূপ।

বুদ্ধির মত সুখও গুণাতীত এবং গুণময়—এই দু'রকমের। সাত্ত্বিক সুখ গুণাতীত সুখেরই প্রচ্ছটা। এটি খুব সুলভ নয়—একে অর্জন করতে হয় অভ্যাসের দ্বারা, যদিও দুঃখের অন্ত হতে পারে একমাত্র এই সুখের দ্বারাই (১৮।৩৬)। সাধ্য-সাধনা করে সুখ পাওয়াটা সবার ভাল লাগে না, তাই বলা হচ্ছে, এ-

সুখ গোড়ায় যেন বিষের মত, কিন্তু পরিণামে তা অমৃতোপম। এটি উৎপন্ন হয় যখন বুদ্ধি এবং আত্মা 'প্রসন্ন' হয়। 'প্রসন্ন' মানে নির্মল জলের মত স্বচ্ছ—উপনিষদে এর সঙ্গে আত্মস্বরূপের তুলনা করা হয়েছে। তত্ত্বদর্শী সাত্ত্বিক বুদ্ধিই প্রসন্ন বুদ্ধি—তার কথা আগেই বলা হয়েছে। এই বুদ্ধি স্থির—বিষয়ে বিচরণ করেও রাগ-দ্বেষের দোলায় দোলে না, কেননা ইন্দ্রিয়েরা তখন আত্মার বশে (২।৬৪)। ইন্দ্রিয়ের উজানে মন, মনের উজানে বুদ্ধি, আর বুদ্ধির উজানে আত্মা (৩।৪২)। বুদ্ধি প্রসন্ন হলে আত্মা স্বরূপে তাতে প্রতিবিম্বিত হন। তখন যে-সুখের অনুভব হয়, তা-ই 'আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ' সাত্ত্বিক সুখ।

প্রশ্ন

অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৫।৪৬ শ্লোক দুইটির তাৎপর্য কি? 'সিদ্ধি' বলিতে কি বুঝিব? কর্মের দ্বারা ভগবদর্চনা হয় কেমন করিয়া? স্বকর্ম বলিতেই বা কি বুঝিব?

উত্তর

কর্ম হল সাধনা, তার সার্থক পরিণাম হল 'সিদ্ধি'। সংজ্ঞাটি গীতায় প্রায়শ কর্মের প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হয়েছে (দ্র. ৩।৪, ৩।১২, ১২।১০, ১৬।২৩)। তবে গীতায় কর্ম আর জ্ঞানে কোনও বিরোধ সৃষ্টি করা হয়নি বলে উত্তম জ্ঞানের ফলে পরা সিদ্ধির কথাও আছে (১৪।১)। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে কাজ করার দরুন যে সত্যকার সন্ন্যাস এবং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি অধিগত হয়, তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কি করে ব্রহ্মভূত হওয়া যায়, তার বর্ণনাও আছে (১৮।৪৯—৫৩)। এই সিদ্ধিই পরমা সিদ্ধি, জীবন-যজ্ঞের সার্থক উদ্‌যাপন।

'স্বকর্ম' হল প্রত্যেকের স্বভাবের অনুকূল কর্ম। অন্যত্র 'অধ্যাত্ম'কে স্বভাব বলা হয়েছে (৮।৩)। তার দুটি অর্থ। এক, আত্মভাব—যখন প্রকৃতি পরা প্রকৃতি (তু. ১০।১১); এইটি জীবের

সত্যকার স্বভাব। আবার যখন আত্মাকে আশ্রয় করে প্রকৃতির গুণ-লীলার কোনও বিশিষ্ট প্রকাশ হয়, তাও অধ্যাত্ম বা, স্বভাব। এই স্বভাবের উপর এ-দেশে গুণ এবং তদনুরূপ কর্মের বিভাগ দ্বারা সমাজে চাতুর্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (৪।১৩)। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণের প্রত্যেকের কর্ম নিরূপিত হতে পারে তার স্বভাবে যে-গুণের প্রকাশ হয়েছে, তার দ্বারা (১৮।৪১)। এইগুলি চতুর্বর্ণের 'স্বভাবজ' কর্ম বা 'স্বকর্ম'—যার একটা বিবৃতি গীতায় আছে (১৮।৪২—৪৪)।

এই কর্মগুলির বেলায় ছোট-বড়র কথা ওঠে না। ব্রাহ্মণের স্বকর্ম যেমন তাকে পরমা সিদ্ধিতে নিয়ে যায়, শূদ্রের স্বকর্মও ঠিক তা-ই করে—যদি তারা কর্মকে অর্চনা করে তুলতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে, জীবন কর্মময় ; কর্মকে যজ্ঞে রূপান্তরিত করা আমাদের দায়—নইলে আমরা কর্মজালে বাঁধা পড়ব ; আর এই যজ্ঞের ভোক্তা ঈশ্বর স্বয়ং। সুতরাং ঈশ্বরের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্মে তাঁর অর্চনা হয়। কোনও কর্মে আসক্তি বা বিরক্তি না থাকা, 'আমি কর্তা' এই ভাব বর্জন করে কাজ করা, আর সমস্ত কর্মের ফল ঈশ্বরে অর্পণ করা—সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে নির্বিকার থেকে, এইভাবে স্বভাবনিয়ত কর্ম করাই হল কর্মযোগের দ্বারা তাঁর অর্চনা। আর তার অধিষ্ঠান হচ্ছে এই জ্ঞান যে, তিনি এই বিশ্ব ছেয়ে আছেন, মানুষের কর্মপ্রবৃত্তি তাঁহতেই উৎসারিত হচ্ছে। এইভাবে কাজ করতে পারলে জ্ঞান ভক্তি এবং কর্মের ত্রিবেণীসঙ্গমে জীবন তীর্থ হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন

'সহজ' কর্ম সদোষ হইলেও ত্যাগ করিতে নাই, ইহার রহস্যার্থ কি ?

উত্তর

কর্ম হয় প্রকৃতির গুণের প্রেষণায়। সংসারে প্রকৃতির গুণগুলি কাজ করে ব্যামিশ্র হয়ে। যে-কোনও গুণে অন্য গুণের সমাবেশ আছে। বস্তুত গুণের ক্রিয়া চলছে তম হতে সত্ত্বের দিকে বা অন্ধকার হতে আলোর দিকে, আবার আলো হতে অন্ধকারের দিকে। কাজেই সর্বত্র আলো-অন্ধকারের মেশামিশি আছেই। শ্রীকৃষ্ণ উদাহরণ দিচ্ছেন আগুন আর ধোঁয়ার মেশামিশির (১৮।৪৮)। অধূমক আগুনকে গুণলীলার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না—পাওয়া যাবে তাকে ছাপিয়ে। সুতরাং এখানে আমরা যা-ই করতে চাই না কেন, তার মধ্যে ধোঁয়া থাকবেই। এই ধোঁয়াকে অন্যত্র বলা হয়েছে মোহ আর কাম, আর জ্ঞানকে বলা হয়েছে আগুন (৩।৩৮—৪০)।

কিন্তু প্রকৃতি যে কেবল আলোর প্রকাশকে অন্ধকার দিয়ে আচ্ছন্ন করতে চাইছে, তা নয়। বরং অন্ধকার ভেদ করে আলো ফোটানোই হল তার তপস্যা, কেননা এইটিই তার ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরের অনুমত কাজ। তার এই আলো ফোটানোর প্রচেষ্টার ধাপে-ধাপে সাজানো রয়েছে আমাদের গুণানুরূপ কর্মব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার একটা স্বাভাবিক পরিণাম আছে, যা কালক্রমে বিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই ক্রমকে লঙ্ঘন করলে তার ফল ভাল হয় না—যেমন কিলিয়ে কাঁঠাল পাকালে সে-কাঁঠালের স্বাদ থাকে না, তার চাইতে বরং কাঁচা কাঁঠালের তরকারি সুস্বাদু হয়।

তাছাড়া আরও-একটা কথা আছে। কর্মের দুটা দিক—একটা অন্তরঙ্গ, আরেকটা বহিরঙ্গ। বহিরঙ্গ কর্ম হল কতকগুলি আচরণ, আর অন্তরঙ্গ কর্ম হল তার মূলভূত ভাব। বাইরের বিচারে আমার কাজ ছোট হতে পারে, কিন্তু সে-কাজই যদি আমি শুদ্ধ ভাব নিয়ে করি, তাকে ঈশ্বরের অর্চনা করে তুলি, তখন তা আর ছোট থাকে না। তখন দেখি ওই ছোট কাজ করেই আমি তাঁকে পেয়ে যাচ্ছি—

তাঁর কাছে তো আমার কাজ ছোট নয়। আর সমাজকে টিকিয়ে রাখতে হলে ওই ছোট কাজ করবার জন্যও তো লোক চাই। তার জন্য তিনি আমাকেই যদি বেছে নিয়ে থাকেন, আমি তাতেই ধন্য। মহাভারতের ধর্মব্যাধ এইজন্য ব্রহ্মজ্ঞানের চূড়ায় উঠেও তাঁর নিয়ত কর্ম ত্যাগ করেননি।

বহিরঙ্গ দৃষ্টিতে কর্মকে ছোট-বড়তে ভাগ করা অজ্ঞানের পরিচয়। জ্ঞানের দৃষ্টিতে অন্তর-বাহিরের ভেদ ঘুচে যায়। তখন সব কর্মই ব্রহ্মভাবন দিব্যকর্ম (তু. ৪।২৪) হয়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণের মত দিব্যদর্শী এবং দিব্যকর্মীরা যখন সমাজের ব্যবস্থাপক হবেন, তখনই তাঁর সৃষ্ট চাতুর্বর্ণ্য তার স্বভাবজ মহিমায় ফুটে উঠবে। তখন অভেদই হবে ভেদের নিয়ামক, কাজেই ভেদের বিষ আর তখন থাকবে না। বিরোধ তখন রূপান্তরিত হবে বৈচিত্র্যে। এই জগতে মহামানবের সাগরতীরে অলক্ষ্যে সেই সাধনাই চলছে।

প্রশ্ন

'ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্' (১৮।৫৫)— এই শ্লোকটির রহস্যার্থ কি ? জ্ঞানের পর আবার অনুপ্রবেশ কি ?

উত্তর

ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব এবং সর্বকর্তৃত্বকে সর্বদা বুদ্ধিস্থ রেখে জীবনের সমস্ত কর্মকে তাঁর অর্চনায় রূপান্তরিত করাই মানুষের সিদ্ধিলাভের সর্বোত্তম উপায় (১৮।৪৬)। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এই সিদ্ধিতে জ্ঞান ভক্তি এবং কর্ম—তিনটি যোগেরই সিদ্ধি অবিরোধে সমন্বিত হয়ে আছে।

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ছাড়া জ্ঞান হয় না এবং কর্মসন্ন্যাস ছাড়া নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি হয় না—একথা যাঁরা বলেন, গীতার মতে তাঁরা অসম্যক্-দর্শী। যাঁর চিত্ত জ্ঞানে অবস্থিত অতএব সংস্কারমুক্ত, কর্মে কিংবা কর্মফলে যাঁর আসক্তি নাই, যিনি যজ্ঞবুদ্ধিতে কর্মের আচরণ করেন, তাঁর সমস্ত কর্মবন্ধন কেটে যায়। তাঁর কাছে সমস্তই ব্রহ্ম' বলে ব্রহ্ম

এবং কর্মে কোনও বিরোধ থাকে না (৪।২২, ২৪)। এইটিই যথার্থ কর্মসন্ন্যাস এবং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি—নতুবা কর্ম ছেড়ে দিলেই নৈষ্কর্ম্য হয় না, কেননা এক মুহূর্তও কর্ম না করে কেউ থাকতে পারে না (৩।৪-৫)। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করাতেই আসে পরম নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, আর তাইতে মানুষের ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফলে জ্ঞানসিদ্ধিও হয়। এই জ্ঞানসিদ্ধির একটি পরিচিতি শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে দিচ্ছেন (১৮।৫১-৫৪) :

জ্ঞানী চিত্তকে রাগ-দ্বেষের উর্ধ্বে রাখেন। তাইতে বাহ্যস্পর্শে তাঁর চিত্ত কখনও আসক্ত হয় না (তু. ৫।২১)। এইটি যথার্থ বিষয়ত্যাগ। এর ফলে তিনি আপনাথেকে নিজের ভিতর গুটিয়ে আসেন। এটি হল তাঁর 'ধৃতি'—নিজেকে নিজের মধ্যে ধরে রাখা, তাকে বাইরে ছিটকে পড়তে না দেওয়া। এই ধৃতিতে তাঁর বুদ্ধি বিশুদ্ধ অতএব মোক্ষাভিসারী হয় (তু. ১৮।৩০)। ইন্দ্রিয়ার্থে আসক্তি এবং লোলুপতা না থাকাই হল বৈরাগ্যের প্রাথমিক লক্ষণ (১৩।৮) এবং তা মনঃসমাধানের হেতু (৬।৩৫)। বৈরাগ্য জ্ঞানের একটি মুখ্য সাধন, তা মনকে ধ্যানযোগের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

অন্তর্মুখ চিত্তে রাজসিক ক্ষোভ থাকে না—তাই কাম ক্রোধ অহঙ্কার দর্প জবরদস্তি বিষয়সঞ্চয়ে দুরাগ্রহ (তু. ১৬।১৩-১৫) এই-সব আসুরিক বৃত্তি দূর হয়ে যায়। জ্ঞানী নির্মম—কোন-কিছুর প্রতি আসক্তিজনিত মোহও তাঁর নাই। এই মোহ চিত্তের তামসিকতার লক্ষণ।

রজস্তমের প্রভাবশূন্য তাঁর চিত্ত শান্ত—কোন-কিছুর জন্য তাঁর শোক বা আকাঙ্ক্ষা কিছুই নাই। আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ সুখে (তু. ১৮।৩৭) তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ।

তাঁর অন্তরের ভাব বাইরের ব্যবহারেও প্রতিফলিত হয়। তিনি কায়মনোবাক্যে সংযত, একা-একা থাকতে ভালবাসেন ; খান কম (তু. ৬।১৬-১৭)।

এই হল জ্ঞানের 'পরা নিষ্ঠা' বা জ্ঞানসিদ্ধি (১৮।৫০)। এই সিদ্ধিই নিয়ে যায় ভক্তির সিদ্ধিতে।

সমাধিতে অন্তরাবৃত্ত হয়ে যিনি আত্মাতে ব্রহ্মকে দর্শন করেন (তু. ৬।১৮-২০), তিনিই ব্যুত্থানে এবং ব্যবহারে সর্বত্র আত্মাকে এবং ব্রহ্মকে দেখেন (তু. ৬।২৯-৩২)। এই দেখার মহাবাক্য হল উপনিষদে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', আর গীতায় 'বাসুদেবঃ সর্বম্' (৭।১৯)। এরই আরেক নাম সমদর্শন (তু. ৫।১৮, ৬।২৯)। নিজেকে বা তাঁকে সর্বত্র দেখার নামই সবাইকে ভালবাসা, আর তাইতে অন্তরে-বাইরে তাঁকে পরিপূর্ণভাবে ভালবাসা। এই ভালবাসাতে ভক্ত অন্তরে 'তত্ত্বত' জানেন তিনি কি, আর বাইরে তাঁর বিভূতি-বিস্তরের ভিতর দিয়ে (তু. ১০।৪০-৪২) জানেন তিনি কতখানি ('য়াবান্ য়শ্চাস্মি তত্ত্বতঃ')। ভালবেসে তাঁকে যে-জানা, তা-ই হল তাঁতে প্রবেশ করা। এ-জানা তত্ত্বজ্ঞানের চাইতে গভীর, কেননা এ হল সব দিয়ে 'সর্বভাবেন' তাঁকে জানা। তখন শুধু চোখ বুজে তাঁকে অন্তরে দেখা নয়, চোখ মেলে বাইরেও দেখা। এইটিই বৈদিক ঋষিদের 'চিন্ময় প্রত্যক্ষ'।

প্রশ্ন

'বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব' (১৮।৫৭)। ভগবচ্চিত্ত হওয়া যায় কেমন করিয়া? সেই বুদ্ধিযোগের রহস্যই বা কি? ভগবৎ-চিত্তের ধারণা করিব কেমন করিয়া? অশেষকল্যাণগুণসম্পন্ন, হেয়গুণবিবর্জিত—ইহাই কি ভগবচ্চিত্ত ধারণার পদ্ধতি?

উত্তর

এর পর দিব্যজীবনের একটি পূর্ণ সঙ্কেত—জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্মের সিদ্ধ সমন্বয়ে।

জীবন কর্মময়। কর্ম না করে কেউ ক্ষণকালও থাকতে পারে না। অতএব কোনও অবস্থাতেই কর্মত্যাগের কোনও প্রশ্ন ওঠে না। তাইতে সবসময় ('সদা') সব কাজই (সর্বকর্মাণ্যপি) করে যেতে হবে—তাঁকে আশ্রয় করে, তাঁর নিমিত্ত হয়ে তাঁর অর্চনারূপে। তাঁকে যখন ভালবাসি, তখন তাঁর কাজ করে চিত্ত প্রসন্নই হবে—একটা স্বচ্ছ লঘু আনন্দে ভরে যাবে। সে-প্রসন্নতা তাঁরই প্রসাদ, তাঁরই আকাশবৎ স্বচ্ছ আনন্দের প্রতিফলন আমার চিত্তে। জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজও যদি এইভাবে করে যেতে পারি, তাহলে তাঁর আলো আনন্দ আর বীর্য জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে ভাস্বর করে তুলবে। তখন এইখানে থেকেই তাঁর শাশ্বত অব্যয় পদ—বেদে যাকে বলা হয়েছে 'বিষ্ণুর পরম পদ'—সেই লোকোত্তর এবং লোকাত্মক আকাশ-আনন্দকে পেয়ে যাব।

বিবাহবাসরে বর যেমন বধূকে বলে 'মচ্চিত্তম্ অনু চিত্তং তে অস্তু'—আমার চিত্তের অনুগত হ'ক তোমার চিত্ত, তেমনি অহরহ আমার চিত্তে বসে তিনি বলে চলেছেন, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুগামী হ'ক। যদি তাঁকে ভালবাসি, যদি আমার চিত্ত তাঁকে দিয়ে 'তৎপর' হয়ে থাকি, তাঁকে ছাড়া আর কিছুই যদি না জানি, তাহলে আমার সবই তো তাঁর। আমার অন্তরে-বাইরে যে কর্মস্পন্দ—সে তো তাঁরই শক্তিস্পন্দ, তাঁরই 'ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গ' (৮।৩)। এর মধ্যে কোন্ কাজটা আবার আমার? এই তো আমার কর্মসন্ন্যাস, তাঁর মধ্যে আমার কর্তৃত্ব করণ আর কর্ম সব-কিছুর বিলয়ন (তু. ৪।২৩)।

এমনি করে তাঁকে ভালবেসে আমার চিত্তকে তাঁর চিত্তে মিলিয়ে দিয়ে 'তৎপর' বা তচ্চিত্ত হওয়া—সহজভাবে। এটি প্রকৃতিভাবের সাধনা। এর মূলে রয়েছে 'শ্রদ্ধাযোগ' (দ্র. সপ্তদশ অধ্যায়)।

এরই সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'বুদ্ধিযোগ'। সেটি পুরুষভাবের সাধনা। তার কথা আগেই বলা হয়েছে—বিশেষত দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২।৪৯-৫১)। বুদ্ধিযোগের সাধনা প্রধানত স্থিতপ্রজ্ঞত্বের সাধনা (দ্র. ২।৫৫-৭২)। কিন্তু পুরুষভাবের সাধনা হলেও এ কিন্তু তাঁরই দান (দ্র. ১০।১০-১১)। আর এখানে বুদ্ধিযোগকে অন্বিত করা হচ্ছে ভক্তির সঙ্গে—এও লক্ষণীয়।

বুদ্ধিযোগের দ্বারা তচ্চিত্ত হওয়ার অর্থ আমার প্রজ্ঞানকে তাঁর প্রজ্ঞানে মিলিয়ে দেওয়া। উপনিষদে তার মহাবাক্য হল 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'।

শ্রদ্ধাযোগে যখন তচ্চিত্ত হই, তখন অনুভব করি—আমার ভালবাসা তাঁরই আনন্দ, তাঁরই প্রসাদ। আমি 'রূপসী তাঁহারি রূপে'। আর বুদ্ধিযোগে তচ্চিত্ত হলে অনুভব করি আমার অন্তরে যে জ্ঞানের আলো, তা তাঁরই চিজ্জ্যোতি হতে তাঁর নিজের হাতে জ্বালানো একটি দীপশিখা (১০।১১)। তখন 'তাঁহারি গরবে গরবিনী হম্'। দুটি ভাব অবিনাভূত।

তাঁর চিত্তের অনুধ্যানের একটি মন্ত্র গীতাতেই আছে—'কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্ অণোরণীয়াংসং…সর্বস্য ধাতারম্ অচিন্ত্যরূপম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' (৮।৯)।

প্রশ্ন

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' (১৮।৬৬)—এই শ্লোকটির রহস্যার্থ কি? সর্বধর্ম পরিত্যাগ বলিতে কি বুঝিব? 'অহং মোক্ষয়িষ্যামি'—এই 'অহং' কে? এই অহং কি ব্যক্ত ব্রহ্ম, ত্রাণকর্তা ঈশ্বর বা পরমগুরু?

উত্তর

গীতার অনুশাসন শেষ হয়ে এল। উপক্রম আর উপসংহারের সঙ্গতি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অনুশাসন শুরু হয়েছিল

কুরুক্ষেত্রে। অর্জুন অনেক প্রজ্ঞাবাদের বুলি আওড়িয়ে শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, 'আমি যুদ্ধ করব না।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'এ তোমার ক্লৈব্য, তোমার হৃদয়দৌর্বল্য। যা নিয়ে শোক করবার নয়, তা-ই নিয়ে তুমি শোক করছ (২।১১)। তুমি যে বলছ, আমি যুদ্ধ করব না—এ তোমার অহঙ্কার মাত্র, প্রকৃতি ঘাড়ে ধরে তোমায় যুদ্ধ করিয়ে নেবে। তোমার স্বভাবজ স্বকর্ম দ্বারা তুমি বাঁধা রয়েছ এখন মোহবশত যা করতে চাইছ না, একদিন অবশ হয়ে তা করে বসবে। আর প্রকৃতি যা করাবে, সে তো ঈশ্বরেচ্ছাতেই—কেননা প্রকৃতি তো ঈশ্বরেরই প্রকৃতি (তু. ৭।৪-৫)। ঈশ্বরই সবার হৃদয়ে থেকে প্রকৃতির যন্ত্রে সবাইকে চড়িয়ে আত্মমায়ায় (তু. 'প্রকৃতিং স্বাম্ অরষ্টভ্য সম্ভরাম্যা-ত্মমায়য়া' ৪।৬) সবাইকে ঘোরাচ্ছেন। কাজেই সর্বতোভাবে তাঁর শরণ নাও, তোমার ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছায় মিলিয়ে দিয়ে তাঁর নিমিত্ত হয়ে কাজ কর। যদি তাঁকে আশ্রয় কর, তাহলে যা-ই কর না কেন, তাঁর প্রসাদে সমস্ত সঙ্কট হতে উত্তীর্ণ হয়ে তুমি শাশ্বত অব্যয়পদ পেয়ে পরা শান্তি লাভ করবে (তু. ১৮।৫৬, ৫৮, ৬২)। এই গুহ্য হতে গুহ্যতর জ্ঞানের কথা তোমায় বললাম—এখন তুমি বেশ করে সব ভেবে দেখ। তারপর তোমার যা ইচ্ছা, তাই কর (য়থেচ্ছসি তথা কুরু ১৮।৬৩)।'

এই শেষের কথাটি অপরূপ। শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ গুরু। শিষ্যকে তিনি ভাল-মন্দ সব বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত তার ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যকে মান দিয়ে বললেন, 'এবার তোমার যা ইচ্ছা তা-ই কর।' সদ্‌গুরু কখনও নিজের ইচ্ছাকে অনিচ্ছুক শিষ্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন না—স্বভাবের প্রবর্তনার উপর সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে তটস্থ থাকেন (তু. ৫।১৪-১৫)।

এর পর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'এইবার আবার শোনাই তোমাকে আমার সর্বগুহ্যতম শেষ কথাটি। তোমাকে আমি বড় ভালবাসি, তাই যাতে তোমার হিত হবে তা-ই বলছি।'

এই সর্বগুহ্যতম কথাটি শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন নবম অধ্যায়ের শেষে—'মানুষী তনুতে ভূতমহেশ্বর পরমভাব' বলে নিজের পরিচয় দেবার পর (৯।১১)। এই রাজগুহ্য অনুশাসন হল :

'মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌য়াজী মাং নমস্কুরু'—মনটি আমাকে দাও, আমাকে ভক্তি কর, আমার যজন কর, আমাকে নমস্কার কর (১৮।৬৫)।

এতক্ষণ পরোক্ষ ঈশ্বরের কথা হচ্ছিল (১৮।৬১-৬২)। এইবার নিজেকে সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে প্রকটিত করে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'সব ধর্ম ছেড়ে দিয়ে একমাত্র আমার শরণ নাও। আমি তোমাকে সব পাপ হতে মুক্ত করব, তুমি শোক করো না (১৮।৬৬)।'

এইবার সিংহাবলোকিত-ন্যায়ে গীতার শেষ অধ্যায় হতে প্রথম অধ্যায়ে ফিরে যাই। যুদ্ধ না করার পক্ষে অর্জুনের যুক্তি ছিল, রাজ্যসুখের লোভে স্বজনবধ করাটা মহাপাপ। এতে যে কুলক্ষয় হবে, তাতে সনাতন এবং শাশ্বত কুলধর্ম আর জাতিধর্ম উচ্ছন্ন যাবে। ফলে কুলস্ত্রীদূষণ এবং বর্ণসঙ্কর। তাতে বংশ সন্তানের উচ্ছেদ এবং পিতৃলোকের অধোগতি। অতএব যুদ্ধ না করাই উচিত (১।৩৬-৪৫)

বর্ণসঙ্করের আশঙ্কার জবাব শ্রীকৃষ্ণ আভাসে আগেই দিয়েছিলেন তৃতীয় অধ্যায়ে। বলেছিলেন, 'যে-কাজ করতেই হবে, অনাসক্ত হয়ে তা করতে পারলেই মানুষ পরমকে পায়। তোমাকে দৃষ্টি দিতে হবে লোকসংগ্রহ বা সমাজস্থিতির উপর। শ্রেষ্ঠেরা যে-আচরণ করেন, সাধারণ লোক তারই অনুবর্তন করে। দেখ, আমার ত্রিলোকে কোনও কর্তব্য নাই। তবু আমি কর্ম নিয়েই আছি। আমি যদি কর্ম না করি, তাহলে সবাই আমার পথ ধরবে, আর তাতে সমস্ত সমাজ উচ্ছন্ন যাবে—বস্তুত দেখা দেবে ধর্মসঙ্কর, যার তির্যক প্রকাশ হল তোমার কল্পিত বর্ণসঙ্কর। আমি হব তার কর্তা, আর সবাইকে ঠেলে দেব বিনাশের মুখে (৩।১৯-২৪)।'

এখানে 'সর্বধর্ম' কথাটার মধ্যে ইঙ্গিত আছে অর্জুনের 'শাশ্বত' জাতিধর্ম আর কুলধর্মের প্রতি। জাতিধর্ম আর কুলধর্ম কখনও শাশ্বত ধর্ম হতে পারে না—'শাশ্বত ধর্ম' হল যজ্ঞভাবনা (দ্র. ১৪।২৭)। জীবনের সমস্ত কর্মকে যজ্ঞে রূপান্তরিত করাই হল শাশ্বত ধর্মের সাধনা। জাতি আর কুলের ব্যবস্থাও এই শাশ্বত ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত—কিন্তু তাকে ছাপিয়ে নয়। জাতি আর কুল হল মনুষ্য-কল্পিত, আর ঈশ্বরসৃষ্ট হল 'বর্ণ' (৪।১৩)। বর্ণবিভাগের প্রকৃত ভিত্তি হচ্ছে গুণ-কর্মের বিভাগ। তিনটি গুণের তিনটি বর্ণ—সত্ত্বগুণ সাদা, রজোগুণ লাল, আর তমোগুণ কালো। গুণের কল্পনা এসেছে সূর্যোদয়ের কল্পনা হতে—একথা আগেই বলেছি। সত্ত্ব আর তমোগুণের মাঝখানে রজোগুণ, তাই তার মধ্যে দেখা দেয় দুটি সন্ধ্যাস্থান। তাইতে তিনগুণ থেকে চারটি বর্ণের উৎপত্তি। এই বর্ণগুলি গুণের বর্ণ—অন্ধকার আর আলোর মধ্যে প্রকৃতির যে ওঠা-নামা, তখনকার রংএর খেলা। অতএব প্রকৃতিতে বর্ণভেদই মূলভূত সর্বকালীন এবং সর্বজনীন—জাতিভেদ তার অশাশ্বত বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

প্রকরণের অনুরোধে সর্বধর্ম বলতে প্রথমত বুঝতে হবে অর্জুনোক্ত জাতিধর্ম আর কুলধর্ম—যা উচ্ছন্ন যাওয়ার ভয়ে অর্জুন যুদ্ধকে বলেছিলেন পাপ, আর 'শোকসংবিগ্নমানস' হয়ে রথের উপর বসে পড়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি ধর্মোৎসাদনের ভাবনা ছেড়ে আমার শরণ নাও। যুদ্ধ করে তোমার যত পাপই হ'ক না কেন, শোক করো না—আমি তোমায় সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করব।'

কথাগুলি এত জোরের সঙ্গে যিনি বললেন, তিনি আর যাদব কৃষ্ণ নন, বাসুদেব কৃষ্ণরূপে সেই পুরুষোত্তম—যিনি 'শাশ্বতধর্ম-গোপ্তা' সনাতন পুরুষ (১১।১৮) এবং অধুনা অর্জুনের সম্মুখে মানুষী তনুকে আশ্রয় করে প্রকটিত (৯।১১)।

অতএব তাঁর বাণীর ব্যঞ্জনা বিশ্বকালীন এবং বিশ্বজনীন। তাই সর্বধর্ম বোঝাচ্ছে মানুষের অবিদ্যাদুষ্ট মনের কল্পিত যত ধর্ম—যার ভাবনা তার চিত্তকে আলোকিত না করে সম্মূঢ়ই করে, তাকে নিশ্চিত শ্রেয়ের সন্ধান দেয় না। কার্পণ্যোপহতস্বভাব এবং ধর্ম-সংমূঢ়চেতা মানুষের তখন প্রপত্তি বা শরণাগতি ছাড়া আর-কোনও পথ থাকে না।

একথা অর্জুন গোড়াতেই বলেছিলেন (দ্র. ২।৭)। কিন্তু সে ছিল তাঁর কাঁচা কথা। শ্রীকৃষ্ণ শিষ্যের প্রপত্তিতে তখন যেন উদাসীন। কিন্তু আঠার অধ্যায় অনুশাসনের পর এইবার তিনি নিজেই তার প্রপত্তি আদায় করে নিলেন, উচ্চারণ করলেন গীতার শেষ অনুশাসন : **'মামেকং শরণং ব্রজ'** জাতি আর কুলের ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে। এইখানে গীতার শেষ আর ভাগবতের শুরু।

প্রশ্ন

'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত' (১৮।৭৩)। স্মৃতির্লব্ধা—ইহার রহস্যার্থ কি? সাধারণ মানুষ বিস্মৃত, সাধকেরই স্মৃতিলাভ হইয়া থাকে। ধ্রুবা স্মৃতিই বা কাহাকে বলে?

উত্তর

অনুশাসন শেষ হয়ে গেল। তারপর বিদ্যাগুপ্তি আর ফলশ্রুতির কথা বলে শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠে মধু ঢেলে দিয়ে অর্জুনকে বললেন,

'যা বললাম, একাগ্রচিত্তে তা শুনলে তো? তুমি তখন যে ধর্ম-সম্মোহের কথা বলেছিলে, তা বাস্তবিক ছিল অজ্ঞানসম্মোহ। এবার তা দূর হল তো?'

'প্রহসন্নির' গীতার অনুশাসন শুরু হয়েছিল (২।১০)। মনে হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণের মুখে-চোখে আবার সেই সাংঘাতিক হাসিটি ফুটে উঠেছে, যার উদ্দেশ ভাগবতের অনেকজায়গাতেই পাই। এ-হাসি যেমন সৃষ্টিতে, তেমনি প্রলয়ে। এর রহস্যের কূল-কিনারা কেউ পায় না। এ তাঁর অনিমিত্তপ্রসাদোত্থ।

অর্জুন বললেন, 'তুমি অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হয়েছে, সন্দেহ চলে গেছে, আমি একটা স্থিরভূমি পেয়ে গেছি। এখন আমার সব মনে পড়ছে। তুমি যা বললে, আমি তা করব।'

এই স্মৃতি লৌকিক কোনও ঘটনার স্মৃতি নয়—এ শাশ্বততত্ত্বের প্রত্যভিজ্ঞা। ঘটনার স্মৃতি অপ্রমাণ। আর এ-স্মৃতি সমস্ত প্রমাণের মূর্ধন্য। এ-স্মৃতি জানিয়ে দেয় তিনি কে, আমি কে—তিনি আমার কে। এ-জ্ঞান তাত্ত্বিক, অতএব শাশ্বত। স্মৃতিও তাই ধ্রুবা।

বর্তমান ক্ষেত্রে এ-স্মৃতির প্রকার হল, 'সাধুর পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য এ-যুগে তোমার যে-সম্ভূতি আর কুরুক্ষেত্রের যে-ঘটনা, আমি তাতে তোমার সব্যসাচী নিমিত্ত মাত্র' (৪।৭-৮, ১১।৩৩।)

প্রশ্ন

পরমগুহ্য যোগের কথা সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে সাক্ষাৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন। সঞ্জয় কি ব্যাসপ্রসাদধন্য (১৮।৭৫)? এখানে কি গুরু-শিষ্যের কোন ইঙ্গিত আছে? সঞ্জয় ব্যাসপ্রসাদে লব্ধদিব্যচক্ষু। দিব্যচক্ষু যিনি দান করেন, তিনিই তো যথার্থ গুরু।

উত্তর

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময় আমরা তিনটি কৃষ্ণ আর একটি কৃষ্ণার উল্লেখ পাই—বাসুদেব কৃষ্ণ, দ্বৈপায়ন কৃষ্ণ, পাণ্ডব কৃষ্ণ আর

যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণা। প্রথম কৃষ্ণ পুরুষোত্তম নারায়ণ, শতপথব্রাহ্মণে যে-নারায়ণকে বলা হয়েছে 'পুরুষ-নারায়ণ', বেদের পুরুষ-সূক্তে যাঁর বিশ্বরূপের বিবৃতি আছে। ইনিই 'পূর্বেষাম্ অপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ'। তাঁর পরা প্রকৃতি পাণ্ডব কৃষ্ণ আর যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণারূপে দ্বিধা বিভক্ত। পাণ্ডব কৃষ্ণ 'নরোত্তম নর'; আর যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণা ভগবদ্‌বিভূতিরূপিণী সেই 'নারী', যার কথা গীতায় আছে (১০।৩৪)। এই নর আর নারী কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের নিমিত্ত।

কুরুক্ষেত্রে নর-নারায়ণের 'ধর্ম্য সংবাদ' (১৮।৭০) বা গীতা বেদসম্মিতা নিত্যা বাক্। তাকে আশ্রয় করে ধর্মসংস্থাপনের জন্যই নারায়ণের সম্ভূতি (৪।৮) এবং কুরুক্ষেত্রের ঘটনা।

এই বাক্‌কে নরলোকে প্রচার করবার দায় ভারত-গুরু দ্বৈপায়ন কৃষ্ণের। তিনি দিব্যচক্ষু (এবং দিব্যশ্রুতি) দিয়ে সঞ্জয়কে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গীতা প্রচারের নিমিত্ত করলেন। যেন আকাশ থেকে অলকানন্দার ধারা নেমে এল হরিদ্বারে। তার পর তা সর্বজনের সেব্য হল।

কৃষ্ণ আর ধনঞ্জয় যেমন শাস্তা এবং শিষ্য, ব্যাস আর সঞ্জয়ও তা-ই। 'ধনঞ্জয়' নামের সঙ্গে 'সঞ্জয়' নামের ধ্বনিসাম্য লক্ষণীয়। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় শেষবারের মতন সম্বোধন করছেন 'ধনঞ্জয়' বলে, এও লক্ষণীয় (১৮।৭২)। তবে ব্যাস এখানে সাক্ষাৎ শাস্তা নন, ব্যাসের প্রসাদকে আশ্রয় করে যোগেশ্বর কৃষ্ণই সঞ্জয়ের সাক্ষাৎ শাস্তা (১৮।৭৫)।

গীতার বাণী প্রথম নেমে এল অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। অনেকে বলেন, ধৃতরাষ্ট্র মন। সে মানব-জীবনের রাষ্ট্রপতি, কিন্তু অন্ধ। তার শতপুত্র দশটি ইন্দ্রিয়ের দশধা বৃত্তি। অন্ধ মনের কাছে গীতা নেমে এল—যেন ভূগর্ভের অন্ধতমিস্রায় একটি চিদ্‌বীজ নিক্ষিপ্ত হল। ওইখান থেকে সে অঙ্কুরিত পল্লবিত পুষ্পিত এবং ফলিত হবে। ঈশ্বরের প্রসাদ হতে কেউ বঞ্চিত হবে না। গীতা সর্বজনতারিণী।

ধৃতরাষ্ট্র তমোগুণের, দুর্যোধন-দুঃশাসন রজোগুণের আর অর্জুন সত্ত্বগুণের প্রতীক—এও লক্ষণীয়। জীবনের কুরুক্ষেত্রে ত্রিগুণের সংক্ষোভ এবং অবশেষে সত্ত্বগুণের বিজয়। ধনঞ্জয় অর্জুনের অপর নাম বিজয় এবং জিষ্ণু।

প্রশ্ন

'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ' (১৮।৭৮)—এই শ্লোকটির রহস্যার্থ কি? শ্রী, বিজয় এবং ভূতি কাহাকে বলে? কৃষ্ণার্জুন বলিতে ভগবান এবং ভক্তকে বোঝায় না কি? কেবল ভগবান এবং ভক্ত কেহই সম্পূর্ণ নহেন। সংযোগ চাই। ঈশ্বরের মত ভক্ত-সত্তাও কি শাশ্বত? ভক্ত-সত্তা হইতেই কি ভক্তের আগমন হয়?

উত্তর

দেবতা মানুষে আবিষ্ট, মানুষের আয়তনেই তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ—একথা উপনিষদে আছে (দ্র. ঐ. উ. পুরুষো বাব সুকৃতম্ ১।২।৩)। দেবতা মানুষে নেমে এসেছেন বলেই মানুষ দেবতা হতে চাইছে। তার এই যে দেবতা হওয়ার সাধনা, তা-ই হল যোগ। সে-যোগের প্রবর্তক এবং প্রবক্তা যোগেশ্বর কৃষ্ণ—কুরুক্ষেত্রের যুগে। কিন্তু এই প্রবর্তনা এবং প্রবচন একটি 'ধ্রুবা নীতি' বা শাশ্বত বিধান (তু. ৪।১-৩)। বাসুদেবার্জুন, নর-নারায়ণ, ইন্দ্র-কুৎস, বশিষ্ঠ-বরুণ ইত্যাদির মাধ্যমে যুগে-যুগে জীব-চেতনার উত্তরায়ণের এই লীলা প্রকট হয়ে এসেছে এবং এখনও হচ্ছে মুমুক্ষু আর মুক্তের যোগাযোগকে আশ্রয় করে।

এই লীলার পরিণাম অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স দুইই। 'ভূতি' অভ্যুদয়, আর 'শ্রী' নিঃশ্রেয়স। দুয়ের সাধন মানুষের যুযুৎসা (তু. ১।১)—অসুর-শক্তির বিরুদ্ধে তার লড়াই এবং তার ফলে দেব-শক্তির 'বিজয়'।

নর আর নারায়ণ, জীব আর ব্রহ্ম, ভক্ত আর ভগবান্, কৃষ্ণ আর অর্জুন সবই একের দ্বিদল প্রকাশ। 'কেবল ভগবান' বা 'কেবল ভক্ত' কথাটা বিকল্পনা মাত্র। জীব 'জীবলোকে' ভগবানেরই সনাতন অংশ (১৫।৭)। লোকোত্তরে জীবলোকও নাই, জীবও নাই—কিন্তু ভগবান আছেন। আর আছেন তাঁর পরমা প্রকৃতি—তাঁর সঙ্গে যুগনদ্ধ হয়ে। সেখানে দুয়ে অচিন্ত্যভেদাভেদ।

॥ সমাপ্ত ॥

ওঁ কৃষ্ণার্পণমস্তু

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

তৃতীয় ষট্‌ক

[১৩শ হইতে ১৮শ অধ্যায়]

মূল

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম ॥ ২
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩
ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬
অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১
জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে ।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি ।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯
কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু ॥ ২১
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে॥ ২৪
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ২৫
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্‌বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ ২৬
সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৭
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২৮
প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি॥ ২৯
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ৩০
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ৩১
যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ৩২
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ৩৩
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

গুণত্রয়বিভাগযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫
কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬
সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭
ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০

অর্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমালোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে **গুণত্রয়বিভাগযোগো** নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পুরুষোত্তমযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১
অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেবচ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥ ১৪
সর্বস্য চাহং হৃদিসন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতি র্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮
যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত॥ ১৯
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে **পুরুষোত্তমযোগো** নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেবচ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ১৬
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্॥ ১৭
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ২১
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২২
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২
সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঁচৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯
যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতম্ তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২
ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে **শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো** নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

মোক্ষযোগঃ

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ॥ ৪
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫
এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮
কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০
নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১২
পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্॥ ১৩
অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্‌বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫
তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥ ১৬
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ॥ ১৮
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥ ১৯
সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ২০
পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১
যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩
যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে॥ ২৫
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬
রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ॥ ২৭
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়॥ ২৯
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ বা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩০
যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩১
অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥ ৩২
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩৩
যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩৪
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী॥ ৩৫
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥ ৩৬
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥ ৩৭

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥ ৪০
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ৪১
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥ ৪২
শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩
কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪
স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ৫০

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫
সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬
চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭
মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬
ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭
য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্‌প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥ ৭১
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥৭২

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪
ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্তা

ওঁ তৎসৎ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু

শান্তিঃপুষ্টিস্তুষ্টিশ্চাস্তু ॥

——

পরিশিষ্ট

মূল গ্রন্থের প্রশ্নোত্তরপ্রসঙ্গে উল্লিখিত

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার

তৃতীয় ষট্‌কাতিরিক্ত শ্লোকাবলী

পৃষ্ঠা	শ্লোক
২	অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৪।৬
২	ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৭।৪
২	অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ ৭।৫
৫	তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৪।৩৪
৫	প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে। প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে॥ ২।৬৫
১২	ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্‌বিপরিবর্ততে॥ ৯।১০
১২	সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্। কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ ৯।৭
১২	প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৯।৮
১২	অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে। ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৮।৩

পৃষ্ঠা	শ্লোক
১২	কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্। তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৩।১৫
১২	ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৭।৪
১২	অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ ৭।৫
১২	এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৭।৬
১৩	অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্। অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥ ৮।৪
১৩	ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্। সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ৫।২৯
১৩	রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্। প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্॥ ৯।২
১৪	অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৪।৬
১৪	নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ৭।২৫
১৫	ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে॥ ৯।১০
১৫	যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া। যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ ৬।২০
১৫	সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্। বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ৬।২১
১৫	যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ৬।২২
১৫	তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্। স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা॥ ৬।২৩

পৃষ্ঠা	শ্লোক
১৬	প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্। উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ৬।২৭
১৬	যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ। স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ৫।২৪
১৬	ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯।৯
১৬	অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১২।১৬
১৭	অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্। অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৮ ৪
১৭	ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ ৯।১০
১৯	যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে। শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ১২।২০
১৯	যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ। অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ১২।৬
১৯	এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু। বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ২।৩৯
১৯	সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৫।৪
১৯	যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে। একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫।৫
১৯	অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব। মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১২।১০
১৯	তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ৭।১৭
১৯	উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্। আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ৭।১৮

পৃষ্ঠা	শ্লোক
১৯	বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ৭।১৯
১৯,	তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১২।১৯
১৯	অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্। বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি॥ ২।১৭
২১	ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা। মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৯।৪
২২	আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৬।৩
২৩	যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ। সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৫।৭
২৪	অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৯।১১
২৫	অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৪।৬
২৫	যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৪।৭
২৫	পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৪।৮
২৫	জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥ ৪।৯
২৬	বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ ৪।৫
২৬	অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৪।৬
২৯	স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি। ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ ২।৩১

পৃষ্ঠা	শ্লোক
২৯	তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১০।১১
৩০	ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত। সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥ ৭।২৭
৩০	অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১২।১৩
৩০	সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১২।১৪
৩০	যস্মান্নোদ্‌বিজতে লোকো লোকান্নোদ্‌বিজতে চ যঃ। হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১২।১৫
৩০	অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১২।১৬
৩০	যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১২।১৭
৩০	শমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥ ১২।১৮
৩০	তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিরমতি র্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১২।১৯
৩১	অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে। ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৮।৩
৩১	কর্ম ব্রহ্মোদ্‌ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্। তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৩।১৫
৩২	অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ। যজ্ঞাদ্‌ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥ ৩।১৪
৩৭	রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্। আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ২।৬৪
৩৯	অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৪।৬

পৃষ্ঠা	শ্লোক
৪০	প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ । ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৯।৮
৪২	অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে। ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৮।৩
৪২	অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ । অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বরঃ ॥ ৮।৪
৪৩	কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম । অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ৮।১
৪৬	অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত । অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২।২৮
৪৭	যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ । বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ২।৪২
৪৭	কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্মফলপ্রদাম্ । ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥ ২।৪৩
৪৯	ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ । ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ৪।২৪
৪৯	দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে । ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ৪।২৫
৪৯	শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ । সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৪।৩৩
৪৯	যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ । যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ৯।২৭
৫০	প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ । অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ৩।২৭
৫০	কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ । মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩।৩৭
৫০	এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা । জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৩।৪৩

পৃষ্ঠা	শ্লোক
৫০	ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ২।৬২
৫১	যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ। সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ৪।২২
৫১	সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১২।১৪
৫১	তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১২।১৯
৫১	ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা। নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩।৩০
৫২	ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন। নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ২।৪৫
৫৩	এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু। বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥ ২।৩৯
৫৩	তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ ১২।৭
৫৩	চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥ ৪।১৩
৫৩	ন মা কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা। ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥ ৪।১৪
৫৩	ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥ ৫।১৪
৫৩	নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ৫।১৫
৫৫	প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ২।৫৫
৫৫	দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ২।৫৬

পৃষ্ঠা	শ্লোক
৫৫	বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ। নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ২।৭১
৫৫	ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ। তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩।৩৪
৫৫	কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩।৩৭
৫৫	এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা। জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৩।৪৩
৫৫	শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ। কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ৫।২৩
৫৫	কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্। অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ৫।২৬
৫৫	যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ। বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ৫।২৮
৫৫	সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ। মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ৬।২৪
৫৫	তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৪।৩৪
৫৭	ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ২।৪১
৫৭	ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ২।৪৪
৫৭	অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৯।৩০
৫৭	ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৯।৩১
৫৮	যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে। শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ১২।২০

পৃষ্ঠা শ্লোক

৫৮ শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৪।৩৯

৫৮ অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪।৪০

৫৯ নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ৬।১৬

৫৯ যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ৬।১৭

৫৯ যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ৬।১৮

৫৯ প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ৬।১৪

৬০ এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৪।৩২

৬০ গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ৪।২৩

৬০ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ৪।২৪

৬০ ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বাং মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ৫।২৯

৬১ শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ৫।২৩

৬২ শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৬।২৫

৬২ যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ৬।২৬

৬২ প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ৬।২৭

পৃষ্ঠা	শ্লোক
৬২	রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্। আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২।৬৪
৬২	প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে। প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ২।৬৫
৬৩	ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্। সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ৫।২৯
৬৩	যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ৯।২৭
৬৪	প্রয়াণকালে চ মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব। ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ৮।১০
৬৪	ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্। যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৮।১৩
৬৫	ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯।৯
৬৫	অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১২।১৬
৬৬	তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্। ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ১১।৩৩
৬৭	অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ২।১১
৬৭	জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন। তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ৩।১
৬৭	কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ৪।১২

পৃষ্ঠা	শ্লোক
৬৮	ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৩।৪
৬৮	ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৩।৫
৬৯	অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ ॥ ৬।১
৬৯	সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ৫।২
৬৯	কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ৩।২০
৬৯	যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ৩।২৩
৬৯	উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্মচেদহম্। সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩।২৪
৬৯	জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি। নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৫।৩
৭০	অবিনাশি তু তদ্‌বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্। বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥ ২।১৭
৭০	তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্। ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ১১।৩৩
৭১	ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৩।৪
৭১	নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৩।৫
৭২	কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ৪।১৮

পৃষ্ঠা শ্লোক

৭৩ সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্‌।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ৬।২১

৭৩ দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্‌ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ২।৪৯

৭৩ বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্‌ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্‌॥ ২।৫০

৭৩ কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্‌॥ ২।৫১

৭৩ যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ২।৫২

৭৩ শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ ২।৫৩

৭৩ প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে॥ ২।৬৫

৭৩ নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্‌॥ ২।৬৬

৭৩ তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্‌।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০।১০

৭৩ তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১০।১১

৭৪ যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৩।৯

৪ যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ৪।১৯

৭৪ শ্রেয়ান্‌ দ্রব্যময়াদ্‌ যজ্ঞাজ্‌ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ৪।৩৩

৭৪ যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৪।৩৭

পৃষ্ঠা	শ্লোক
১৪	কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি । যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ৫।১১
১৪	শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া । আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৬।২৫
১৫	তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ । স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥ ৬।২৩
১৫	সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ । মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ৮।১২
১৫	সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ । সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ৬।১৩
১৬	সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ । নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ৯।১৪
১৬	ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে । শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ১২।২
১৬	তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ । স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥ ৬।২৩
১৬	প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ । উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ৬।২৭
১৬	বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ । স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ৫।২১
১৬	যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ । সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ৬।২৮
১৭	সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ । বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ৬।২১
১৭	রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ । আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২।৬৪
১৭	প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে । প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ২।৬৫

পৃষ্ঠা	শ্লোক
৭৭	ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ ৩।৪২
৭৭	ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৩।৪
৭৭	কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥ ৪।১২
৭৭	অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব। মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১২।১০
৭৭	অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে। ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৮।৩
৭৭	তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১০।১১
৭৮	চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥ ৪।১৩
৭৯	ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ। যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ ৩।৩৮
৭৯	আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা। কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩।৩৯
৭৯	ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে। এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৩।৪০
৮০	ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥ ৪।২৪
৮১	যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ। সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ৪।১২
৮১	ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥ ৪।২৪
৮১	ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৩।৪

পৃষ্ঠা শ্লোক

পৃষ্ঠা	শ্লোক
৮৩	গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ৪।২৩
৮৪	দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়। বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ২।৪৯
৮৪	কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ। জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ২।৫১
৮৪	প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ২।৫৫
৮৪	এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি। স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি॥ ২।৭২
৮৪	তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০।১০
৮৪	তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১০।১১
৮৫	অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ২।১১
৮৫	ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৭।৪
৮৫	অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ ৭।৫
৮৫	অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৪।৬
৮৫	ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥ ৫।১৪
৮৫	নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ৫।১৫
৮৬	অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৯।১১

পৃষ্ঠা **শ্লোক**

৮৬ তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ১।৩৬

৮৬ যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ১।৪৫

৮৬ তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ৩।১৯

৮৬ কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ৩।২০

৮৬ যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ৩।২১

৮৬ ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ৩।২২

৮৬ যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ৩।২৩

৮৬ উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩।২৪

৮৭ চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ৪।১৩

৮৭ ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১১।১৮

৮৭ অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ৯।১১

৮৮ কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ২।৭

পৃষ্ঠা	শ্লোক
৮৯	তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত। সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ২।১০
৮৯	যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৪।৭
৮৯	পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৪।৮
৮৯	তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্। ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ১১।৩৩
৯০	মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্। কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥ ১০।৩৪
৯০	পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৪।৮
৯১	ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্। বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ৪।১
৯১	এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ। স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥ ৪।২
৯১	স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥ ৪।৩
৯১	ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়॥ ১।১